দল-দীপশিখা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

দল-দীপশিখা

প্রধান সম্পাদক

রাকিবুল ইসলাম রাকিব

সম্পাদক

নাছির উদ্দিন নাছির

নির্বাহী সম্পাদক

মিনহাজ আহমেদ প্রিন্স

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

মো. নিজাম উদ্দিন
হাসান আল আরিফ
ফারহান আরিফ
মাহমুদ ইসলাম কাজল
হাবিবুর রহমান
তানভীর হাসান
সৌমিক আহমেদ অনিক

অলঙ্করণ

মো. হাসান কবির
মো. জুবায়ের হোসেন শিমুল
মো. শান্ত রহমান

গ্রাফিক্স আর্টিস্ট

সৈয়দ শাহাদাৎ হোসেন

যোগাযোগ

দল-দীপশিখা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
২৮/১ নয়াপল্টন, ঢাকা
মোবাইল: +৮৮০১৫৭৭২০১৬৭৭
ইমেইল: jcdpublication.bd@gmail.com
দল-দীপশিখার নির্বাহী সম্পাদক এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এর সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মিনহাজ আহমেদ প্রিন্স কর্তৃক ২৮/১ নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

মূল্য: ২০ টাকা

সূচিপত্র

■ *সম্পাদকীয়* ৩

■ *গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলো* ৪-৫

■ *শহীদদের স্মরণে* ৬-৮

আবু সাঈদ স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে - *মকবুল হোসেন*

আমার ভাই ওয়াসিম - *সাবিনা ইয়াসমিন*

মানবিকতার প্রতীক আমার মুগ্ধ - *মীর মোস্তাফিজুর রহমান*

■ *বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ* ১০-১১

রক্তস্রোতে নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম - *নূরে আলম পিন্টু*

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা - *অধ্যাপক ড. শামীমা সুলতানা*

■ *স্মৃতিচারণা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা* ৫

জুলাইয়ের বৃক্ষ - *মো. আতিকুর রহমান*

কওমি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল সুসংগঠিত - *মুফতি জামিল সিদ্দিকী*

রক্ত ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হয়নি - *আশরাফুল আলম*

“চোখ হারিয়েছি কিন্তু আশা হারাইনি”- *মোহাম্মদ আলমিরাজ*

■ *কবিতা* ৫-৮

■ *ফটোফিচার* ৫-৮

সম্পাদকীয়

জুলাই: এক অগ্নিশপথের নাম

জুলাই- এটি শুধু ক্যালেন্ডারের একটি মাস নয়; এটি বাংলাদেশের তারুণ্যের বুকে জ্বলে ওঠা অগ্নিশপথের প্রতীক, আত্মত্যাগ ও অবিচল সাহসিকতার এক নাম। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। দেশের তরুণ প্রজন্ম প্রমাণ করেছেন- অন্যায়, দমন-পীড়ন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মশাল কখনো নিভে যায় না।

জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলো ছিল দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক ক্রান্তি কালীন মুহূর্ত। যখন স্বাধীনতার মূল চেতনা, ভোটাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় সংকটে, তখনই দেশের তরুণ সমাজ রাজ পথে নেমে এসেছিলেন বুকের রক্ত দিয়ে সেই সংকট ভাঙার শপথ নিয়ে। তারা জানতেন- এই পথ রক্তাক্ত হবে, তবুও তারা পিছু হাঁটেননি।

এই সংগ্রামে আমাদের অসংখ্য সহযোদ্ধা গুরু তর আহত হয়েছেন কেউ কেউ চিরতরে হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি, অনেকেই হারিয়েছেন জীবন। তবুও তারা এক মুহূর্তের জন্য ও মাথানত করেননি। তাদের অদম্য বিশ্বাস ছিল– একটি মুক্ত, গণতান্ত্রিকবাংলাদেশ গড়ে তোলা। যেখানে মানুষের কণ্ঠস্বর হবে অমলিন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবিচল থাকবে, আর রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে।

জুলাই আন্দোলনের ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা প্রমাণ করেছেন স্বৈরাচারের রক্তচক্ষু, হত্যা, গ্রেপ্তার কোনো কিছুর ভয়েই থামাতে পারেনি তাদের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে। তারা দেখিয়েছেন, কীভাবে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্যাদারক্ষা করতে হয়। জুলাইয়ের উত্তাল দিনে যখন অনেকেই ভয় ও দমননীতির কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন, তখন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা রাস্তায় নেমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারে অটল থেকেছেন। তাদের সাহস, ত্যাগ ও সংগঠিত প্রতিরোধ প্রমাণ করেছে ছাত্রদল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক প্রতিচ্ছবি।

আজ, জুলাই আন্দোলন আমাদের মনে করিয়ে দেয় দমন যতই বাড়ুক, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই কখনো নিঃশেষ হয় না। জাতীয়তাবাদীদের রক্তে লেখা এই ইতিহাস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অনুপ্রেরণার স্থায়ী দলিল হয়ে থাকবে।

এই আন্দোলন নতুন প্রজন্মকে শিখিয়েছে, অধিকার আদায়ে রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকাটাই প্রকৃত দেশ প্রেমের পরিচয়। শহীদদের সেই উত্তরাধিকার এখন আমাদের হাতে যা রক্ষা করা, এগিয়ে নেওয়া এবং সফল পরিণতিটানা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

যখন ফ্যাসিবাদী শাসক গোষ্ঠী রাষ্ট্র যন্ত্রের অপব্যবহার করে গণতন্ত্রের লেবাসে স্বৈরতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল, তখন ছাত্রদলই সেই অদম্য শক্তি, যারা এই অন্ধকার ভেদ করেআলোর পথ দেখাতে রাজপথে সংগ্রাম করেছে।

জুলাই মাসের এই আত্মনিবেদিত আন্দোলন দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছে ভয়, দমন, বানির্বিচার গুলি কোনো দিনই সত্যকে, জনগণের দাবিকে পরাজিত করতে পারে না। আমরা গর্বিত যে এই প্রজন্ম আবারও দেখিয়েছে: দেশ প্রেম মানে ত্যাগ, নেতৃত্ব মানে সাহস, আর ছাত্র দল মানে সংগ্রামের প্রতীক। ●

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ,
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জিন্দাবাদ

গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলো

২০১৮

এপ্রিল মাসে শাহবাগে পাঁচ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হয়। যার মধ্যে কোটা ১০% এ নামানোর দাবি ছিল। ৮ এপ্রিল পুলিশ আন্দোনকারীদের ওপর ব্যাপক দমন-নিপীড়ন শুরু করে। তিন দিনের তীব্র আন্দোলনের পর ১১ এপ্রিল তৎকালীন অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব কোটা বাতিল ঘোষণা করেন।

২০২১

ডিসেম্বর মাসে সাতজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সরকারি প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন।

৫ জুন ২০২৪

হাইকোর্ট সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য ৩০% কোটা পুনর্বহাল করেন।

২ জুলাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শাহবাগ অবরোধ ও মিছিল করে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি তোলেন।

৪ জুলাই

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যানারে শিক্ষার্থীরা শাহবাগ ছয় ঘণ্টা অবরোধ করেন।

৭ জুলাই

শিক্ষার্থীরা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন।

১০ জুলাই

আপিল বিভাগ কোটার রায়ের ওপর চার সপ্তাহের স্থিতাবস্থা দেন এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষায় ফেরার নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করে বাংলা ব্লকেড চালিয়ে যান।

১১ জুলাই

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সমর্থন জানায় ছাত্রদল। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা, যার প্রেক্ষিতে শাহবাগ থানায় একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এদিন ১২ শিক্ষার্থীরা বঙ্গভবনে গিয়ে সরকারি চাকরিতে কোটার সংস্কার দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

১৪ জুলাই

কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে শেখ হাসিনার হঠকারী মন্তব্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাতে মশাল মিছিল বের করেন এবং "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!" স্লোগান তুলে। এই স্লোগানে ভূমিকা রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

১৫ জুলাই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা চালায় সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। তাদের হামলায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীসহ অসংখ্য শিক্ষার্থী আহত হন।

১৬ জুলাই

ঢাকাসহ চট্টগ্রাম ও রংপুরে সংঘর্ষে অন্তত ছয় শিক্ষার্থী নিহত হন। যাদের মধ্যে আবু সাঈদ ও চট্টগ্রামের ওয়াসিম আকরাম ছিলেন। এদিন আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সর্বাত্মকভাবে রাজপথে থাকার ঘোষণা দেয় ছাত্রদল।

অবৈধ ফ্যাসিবাদী সরকারকে হটিয়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সমাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে উদাত্ত আহ্বান জানায় ছাত্রদল।

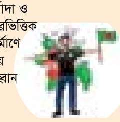

১৭ জুলাই

ভোররাত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বের করে দেন শিক্ষার্থীরা। সকাল ১০ টার মধ্যে হলগুলো ছাত্রলীগ মুক্ত হয়ে যায়। এদিনই দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে ফ্যাসিস্ট সরকার। বিকেলে নিহতদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়েবানা জানাজা পড়তে গেলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে।

১৮ জুলাই

ঢাকায় ভয়াবহ সংঘর্ষে মুগ্ধ, ফারহান ফাইয়াজসহ অসংখ্য মানুষ নিহত হন। বিকেলে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯ জুলাই

দুই দিনের সংঘর্ষে বহু মানুষ নিহত হন। হেলিকপ্টার থেকে টিয়ারগ্যাস ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপ ছাদে খেলতে গিয়ে গুলিতে নিহত হয়।

২০ জুলাই

আওয়ামী সরকার কারফিউ ঘোষণা করে। সকালে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে কারফিউ উপেক্ষা করে সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল করেন। সন্ধ্যায় বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের সঙ্গে ৮ দফা দাবি নিয়ে বৈঠক করেন।

CURFEW!

২১ জুলাই

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ঘোষণা দেন- "এক দফা এক দাবি, খুনি হাসিনার পদত্যাগ"। আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের কয়েকটি পয়েন্টে আন্দোলন ভাগ করে দেন। এদিন আপিল বিভাগ সরকারি চাকরিতে ৯৩% মেধা এবং ৭% কোটা রাখার সুপারিশ করেন।

২২ জুলাই

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৫৬ সমন্বয়কের যৌথ বিবৃতিতে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

২৩ জুলাই

সরকার ৭% কোটা রেখে গেজেট প্রকাশ করে। তবে শিক্ষার্থীরা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি অব্যাহত রাখেন।

২৪ জুলাই

কারফিউ শিথিল করে সরকারি অফিস খুলে দেওয়া হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে চালু হয়। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও চালু হয়।

২৫ জুলাই

শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্ত মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২০৪ জনে পৌঁছায়।

২৬ জুলাই

শেখ হাসিনা হাসপাতালে আহত আন্দোলনকারীদের দেখতে যান। হাসপাতালে গিয়ে তিনি বলেন, "নো ট্রিটমেন্ট, নো রিলিজ"। এদিন থেকে রাজধানীতে ব্লক রেইড শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বকর মজুমদারকে ডিবি (গোয়েন্দা শাখা) তুলে নিয়ে যায়।

২৭ জুলাই

ডিবি আরও দুই সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলমকে তুলে নেয়।

২৮ জুলাই

সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকেও ডিবি তুলে নেয়। ছয় সমন্বয়ক ডিবি হেফাজত থেকে ভিডিও বার্তায় আন্দোলন সমাপ্তির ঘোষণা দেন। অন্য সমন্বয়করা দাবি করেন, এটি জোরপূর্বক করানো হয়েছে।

২৯ জুলাই

সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হয়রানি ও গণগ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান জানান। তারা আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি জানান। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে ৩০ জুলাই শোকদিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সরকার ঘোষিত শোকদিবস প্রত্যাখ্যান করেন আন্দোলনকারীরা।

৩০ জুলাই

সরকার ৩০ জুলাইকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে এবং সবাইকে কালো পোশাক পরতে অনুরোধ করে। সরকারের এই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ছাত্রদলের মাধ্যমে দেশবাসীকে লাল ব্যাজ ধারণের আহ্বান জানান। এরপর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরের পরামর্শে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন লাল ব্যাজ ধারণের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

৩১ জুলাই

সারাদেশে মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচি পালন করা হয়। ঢাকায় শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টের দিকে মিছিল করেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কাছে পুলিশ তাদের থামায়। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্ররা দোয়েল চত্বরে জড়ো হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। প্রায় তিন ঘণ্টা বিক্ষোভের পর বিকেল ৩টার দিকে ঢাকায় বিক্ষোভ শেষ হয়।

১ আগস্ট

ডিবি হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে মুক্তি দেওয়া হয়। সব হত্যার বিচার, সহিংসতা, গণগ্রেপ্তার আর হয়রানি বন্ধের দাবিতে ১ আগস্ট রাজপথে নামেন শিল্পীরা। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে সরকার।

২ আগস্ট

হাজারো মানুষের স্লোগানে মুখর 'দ্রোহযাত্রা'য় গণগ্রেপ্তার বন্ধ, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ তৎকালীন সরকারের পদত্যাগ দাবি করা হয়। এ দিন মোবাইল ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যম মেসেঞ্জার পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে ছাত্র-জনতার গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

৩ আগস্ট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করেন। শেখ হাসিনা আলোচনার প্রস্তাব দিলেও শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৪ আগস্ট

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিন। সরকার আবারও সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়; যা ছিল দ্বিতীয় দফার ইন্টারনেট বন্ধ। সন্ধ্যা ৬টা থেকে দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ ঘোষণা করে। ৬ আগস্টের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি একদিন এগিয়ে নিয়ে ৫ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়।

৫ আগস্ট

শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। ছাত্র-জনতা গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয় সংসদে ঢুকে উদযাপন শুরু করেন। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং পরে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত জানান। স্বৈরাচারের পতন ঘটানোয় দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

কৃতজ্ঞতায়: ঢাকা ট্রিবিউন, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সমকাল, কালের কণ্ঠ, ইত্তেফাক, মানবজমিন।

ছবি: সংগৃহীত

> *স্বপ্ন ছিল বিসিএস ক্যাডার হওয়ার, লড়ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে। অথচ পুলিশের গুলিতে লাশ হয়ে ফিরলেন শহীদ আবু সাঈদ*

আবু সাঈদ স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে

মকবুল হোসেন
(শহীদ আবু সাঈদের পিতা)

আমার ছেলে আবু সাঈদ ছিল খুবই মেধাবী, পরিশ্রমী এক ছেলে। এসএসসিতে সে গোল্ডেন এ-প্লাস পেয়েছিল। এরপর রংপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়, কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। এতোটাই কষ্ট করেছি তার পড়াশোনার জন্য গরু বিক্রি করে ভর্তি টাকার বন্দোবস্ত করেছি। একবার পরীক্ষার সময় একটা জমি ৩০ হাজার টাকায় বন্ধক রাখতেও বাধ্য হয়েছি। ঢাকায় ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল গোপালগঞ্জে পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয় ১৬ নম্বরে ছিল। কিন্তু আর্থিক কারণে সেখানে ভর্তি হতে পারেনি। পরে রংপুরে এসে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং অনার্স পাস করার পর নিবন্ধন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়। আমাদের কষ্ট আর ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সে এগিয়েছিল তার স্বপ্ন পূরণের পথে।

আমাদের জানা ছিল না, আবু সাঈদ কোটা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। জানতাম, কোটা আন্দোলনে সে যাবে না। একবার সে আমাদের জানিয়েছিল যে, তারা সরকারবিরোধী কোনো আন্দোলনে নেই। কিন্তু ছাত্রলীগের লোকেরা গলা চেপে ধরে, গালাগাল করে মারধর করে, তারপর সে রাস্তায় নেমে পড়ে। বাড়িতে কোনো খবর দেয়নি সে। বন্ধু-বান্ধবকেও নিষেধ করেছিল যেন কেউ খবর না দেয়। ১৬ জুলাই ২০২৪, সকাল ১১টা। সে মিছিলে গেল, কিন্তু সকালের ভাত খায়নি, শুধু নাস্তা-পানি খেয়েছিল। শুনলাম দেড়টার সময় সে মারা গেছে। যখন সে মাটিতে পড়ে ছিল ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তাররা মৃত ঘোষণার পর লাশ আনার সময় পুলিশ লাশ নিয়ে যায়। বিকেল ৩টার সময় খবর আসে আবু সাঈদ মারা গেছে। আমরা ছেলেকে দেখতেও দেওয়া হচ্ছিলো না। ইউএনও, পুলিশসহ প্রশাসনের লোকেরা জোর করেন রাতেই দাফন করতে। আমি রাজি হইনি। আত্মীয়-স্বজনরা লাশ দেখবে কেবল তারপর দাফন হবে। শেষমেশ রাত সাড়ে তিনটার দিকে লাশ আমাদের হাতে দেওয়া হয়।

পরের দিন মসজিদের সামনে জানাজা হয়, যেখানে মানুষের ভিড় এত বেশি ছিল যে সবাই জায়গা পায়নি। প্রশাসন বলে- একাধিকবার জানাজা দিতে, কিন্তু আলেম-ওলামারা রাজি হয়নি। পরে কামিল মাদ্রাসার মাঠে জানাজা হয়। সেখানে আমি ভিড়ের মধ্যে পৌছতে পারিনি। লাশ নামানোর দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি। কীভাবে লাশ সমাধিস্থ হল তা আমি দেখিনি। আমার ছেলে বড় হতে চেয়েছিল। তার অনেক স্বপ্ন ছিল। বিসিএস ক্যাডার হতে চেয়েছিল। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমাদের যোগাযোগ কমে গিয়েছিল। মোবাইলও ছিল না তার। শেষবার গত বছর কোরবানির ঈদে বাড়িতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারপর আর হয়নি।

ছেলের মৃত্যুর খবর আমার কাছে একটি অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। ওইদিন আমি মাঠে কাজ করছিলাম হঠাৎ খবর পেলাম আবু সাঈদের কিছু হয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখলাম পাশের বাড়ির মানুষ কাঁদছে, কেউ মুখ খুলল না। পরে শুনলাম গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মারা গেছে। আমি কাঠের ওপর বসেছিলাম, কখন মাটিতে বসে পড়েছি জানি না। আমার ছেলে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ে শহীদ হয়েছে। কিন্তু দেশে তো এখনো ঘুষ ছাড়া চাকরি পাওয়া যায় না। বৈষম্য কীভাবে দূর হবে? আমি আশা করি পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকার এটা করবে। আমার ছেলের আত্মত্যাগ কেউ যেন ভুলে না যায়। দেশের মানুষ যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে আর মুখ খুলতে পারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আমি এখন ছেলেহারা। অনেকবার সাংবাদিককে বলেছি, আমার যা গেছে গেছে। আর কোনো মায়ের কোল যেন খালি না হয়। দেশ যেন শান্তিতে থাকে। ছেলেকে শহীদ করেছে যারা, তাদের বিচারের আশা রাখি। আমার জীবদ্দশায় ছেলের হত্যার বিচার দেখতে চাই। আমার ছেলের সঙ্গে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের সবার হত্যার বিচার চাই। ●

অনুলিখন: তানভীর হাসান

শহীদ ওয়াসিম আকরাম

> শহীদ ওয়াসিম মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিলেন রাজপথের কণ্ঠস্বর। ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রত্যেক মিছিলে তার উপস্থিতি ছিল দৃঢ়, নির্ভীক। আজ তিনি নেই, কিন্তু তার সাহস ছড়িয়ে গেছে হাজারো তরুণের হৃদয়ে

আমার ভাই ওয়াসিম

সাবিনা ইয়াসমিন
(শহীদ ওয়াসিমের বোন)

ওয়াসিম আকরাম শুধু আমার ভাই নয়, আমাদের পরিবারের শক্তি, আমাদের স্বপ্নের কেন্দ্র। উনি ছিলেন হাসিখুশি, মায়াবী, আর সবার প্রিয়। আজও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে, উনি আমাদের মাঝে নেই। ভাইয়া চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা জানতাম উনি আন্দোলনে করেছেন। তবে এমন কিছু হতে পারে তা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। ভাইয়ার চোখে দেখতাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি। উনি সবসময় বলতেন, "অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ানো যায় না।"

পড়াশোনার জন্য ভাইয়া চট্টগ্রাম শহরে চকবাজারের একটি মেসে থাকতেন। পড়াশোনার ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিটি আন্দোলনে অংশ নিতেন। সহপাঠীরা আমাদের বলেছেন- ভাইয়া ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিটি কর্মসূচিতে সামনের সারিতে থাকতেন। কোটা আন্দোলনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন ফেসবুকে লিখেছিলেন- "সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে আছে আমার প্রাণের সংগঠন। আমি এই পরিচয়েই শহীদ হবো।" কে জানত- সেই কথাই তার জীবনের শেষ বার্তা হবে? ১৬ ঘণ্টা পরই উনি শহীদ হলেন- আমার ভাই নিজের বলা কথা রেখেছেন।

১৬ জুলাই বিকেল তিনটার দিকে চট্টগ্রামের মুরাদপুরে পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হন ওয়াসিম। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, শুধু পুলিশের গুলি নয়, আওয়ামী লীগের ক্যাডারাও গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলিই কেড়ে নিল আমার ভাইকে। খবর পেয়ে আমরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মা শুধু চিৎকার করে বলছিলেন- "আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।" বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় আমি প্রথমবার শুনলাম, আমার সেই দৃঢ়চেতা বাবা কাঁদছেন।

ওয়াসিম ছিলেন আমাদের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বাবা কাতারে চাকরি করেন, বড় ভাই চাকরি করেন, আর আমরা বাকি তিনজন এখনও পড়াশোনা করছি। বাবা সবসময় বলতেন-ওয়াসিমই একদিন আমাদের পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করবে। সেই স্বপ্নের ওপর যেন বজ্রপাত হলো। চাচা মাওলানা জয়নাল আবেদীন নিজ হাতে জানাজা পড়ালেন ১৭ জুলাই সকালে। যখন ভাইয়ের লাশ গ্রামে এলো, তখন আমাদের গ্রামের মানুষ কাঁদছিলেন। সবাই বলছিলেন, ওয়াসিম ছিল বিনয়ী, সবার আপন।

আমার ভাইকে হারিয়ে আমরা শুধু একজন প্রিয়জন হারাইনি- আমরা হারিয়েছি একজন স্বপ্নবাজ তরুণকে, যিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু কেন তাকে মরতে হলো? তার কী দোষ ছিল? সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো কি এত বড় অপরাধ?

আমরা সরকারের কাছে একটাই দাবি জানাই- আমার ভাইয়ের হত্যার সঠিক বিচার হোক। যারা এই হত্যার সঙ্গে জড়িত, তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক। যেন আর কোনো বোনকে তার ভাইকে হারাতে না হয়, কোনো মা তার ছেলের লাশ দেখতে হয়। ওয়াসিম আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তিনি যে স্বপ্ন দেখে গেছেন তা হলো বৈষম্যমুক্ত দেশের। আমরা সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেঁচে থাকব। আমার ভাই শহীদ হয়েছেন, তবে তিনি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখতেন তা কখনো শেষ হবে না। ●

অনুলিখন: তানভীর হাসান

মানবিকতার প্রতীক আমার মুগ্ধ

মীর মোস্তাফিজুর রহমান
(শহীদ মুগ্ধের পিতা)

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের প্রেরণাদায়ক গ্রাফিতি

আমি সবসময়ই আমার সন্তানদের বলেছি- "তোমরা নিজেরা ঠিক করো, কীসে তোমাদের জীবনের মানে খুঁজে পাবে"। কোনো মতাদর্শ আমি তাদের ওপর চাপিয়ে দিইনি। আমি চেয়েছিলাম তারা যেন নিজেরা নিজেদের পথ তৈরি করে নেয়। আমার তিন ছেলে- দীপ্ত, সিগ্ধ আর মুগ্ধ ধর্মীয় আবহে, দেশপ্রেমের আদর্শে বড় হয়েছে। সমাজের জন্য কিছু করার তাগিদ তাদের ভেতরে ছিল ছোটবেলা থেকেই। আমি গর্বিত কারণ আমার ছেলেরা কেবল বইয়ের ভেতরেই আটকে থাকেনি; মাঠে, সমাজে, মানুষের পাশে থেকে তারা বড় হয়েছে।

সিগ্ধ আর মুগ্ধ দুজনেই দারুণ ফুটবল খেলত। মুগ্ধ ছিল পাইওনিয়ার ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড়। আমি মনে করি ফুটবলই মুগ্ধকে শিখিয়েছে দলবদ্ধতা, শৃঙ্খলা আর জেতার ক্ষুধা। ক্লাবের কোচরা তার খুব প্রশংসা করত। শুধু খেলাধুলায় নয়, ভ্রমণেও ছিল তার এক অদম্য নেশা। সময় পেলেই বন্ধুদের নিয়ে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে মুগ্ধকে বলতাম, "এত ভ্রমণ করো কেন?" সে হাসত আর বলত- "বাবা, দুনিয়াটা দেখতে হবে, মানুষকে জানতে হবে"। এমনই ছিল আমার ছেলে- অদম্য কৌতূহলী, উদার, আর প্রাণবন্ত।

মানুষের দুঃখে পাশে দাঁড়ানো যেন তার স্বভাবেই ছিল। বনানীর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় মুগ্ধকে আমি চিনেছিলাম নতুনভাবে। রেডক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবী হয়ে সে আগুন নেভানোর লড়াইয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাশে দাঁড়িয়েছিল। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে তাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। আমি দেখেছি মানুষের বিপদে মুগ্ধ নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে এগিয়ে যেত। কোনো হিসেব করত না- সম্ভব কি না, ভয় আছে কি না। সে শুধু জানত, মানুষকে বাঁচাতে হবে।

আমার মুগ্ধ সরাসরি কোনো রাজনীতিতে যুক্ত ছিল না। কিন্তু আমার মতোই রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল। দেশের অবস্থা, মানুষের অধিকার- সবকিছু নিয়েই ওর ভেতরে ছিল অস্থিরতা। তাই যখন বাংলাদেশের রাজপথ যৌক্তিক কোটা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল, তখন মুগ্ধও চুপ করে থাকতে পারেনি। বন্ধুদের নিয়ে সে নামল উত্তরার আজমপুর পয়েন্টে।

> *স্বেচ্ছাসেবক, খেলোয়াড়, প্রতিবাদী কণ্ঠ- মুগ্ধ ছিলেন আলোর এক বহ্নিশিখা। বনানীর আগুন নেভানো থেকে শুরু করে রক্তাক্ত জুলাই, সবখানেই ছিল তার উপস্থিতি*

১৭ জুলাই মুগ্ধ আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা করিয়েছে নিজের টাকায়। বাবার কাছে না চেয়ে, কারও কাছ থেকে না নিয়ে; নিজের জমানো টাকায়। আমি ভাবি এই বয়সেই ওর ভেতরে এতটা দায়বদ্ধতা কীভাবে এলো? কিন্তু ১৮ জুলাই, সে দিনটা আমার জীবনের কালো দিন। সেদিন মুগ্ধ শহীদ হওয়ার আগে আমাকে আরেকটা গল্প দিয়ে গেছে। পুলিশ যখন আরেক শহীদের লাশ গুম করতে চেয়েছিল, তখন আমার মুগ্ধ আর তার সহযোদ্ধারা সেই লাশ পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনে। এম্বুলেন্সে করে লাশটি পাঠিয়ে আবার ফিরে আসে রাজপথে। মুগ্ধ এবার নিজের টাকায় পানি আর বিস্কুট কিনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিল। "পানি লাগবে? পানি।" ওর শেষ উচ্চারণগুলো হয়তো ভিডিওতে আছে, হয়তো কারও কানে বাজে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আজ আমার বুকের ভেতর তীব্রভাবে বাজে।

কিন্তু স্বৈরশাসনের পাহারাদারদের পিপাসা পানিতে মেটে না। তারা চায় রক্ত। মুগ্ধ জানত না, পানি বিলাতে গিয়ে সেদিন সে নিজের জীবনের শেষ ফোঁটা রক্ত ঢেলে দেবে এই মাটিতে। আমার মুগ্ধ রাজপথে লুটিয়ে পড়ল পুলিশের গুলিতে। আমি বাবার হৃদয়ে কতটা শূন্যতা নিয়ে বেঁচে আছি, সেটা বলার ভাষা নেই। কিন্তু আমি এটুকুই জানি- মুগ্ধ বৃথা যায়নি। সে জানিয়ে গেছে মানবিকতা কখনও স্বৈরশাসনের বন্দী হতে পারে না। যে ছেলে মানুষের পিপাসা মেটাতে গিয়েছিল- আজ সে বাংলাদেশের মুক্তির পিপাসা মেটানোর প্রতীক।

আমার মুগ্ধ আজ শুয়ে আছে উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের মাটিতে। মানুষ বলে- "পানির অপর নাম মুগ্ধ," হয়তো ঠিকই। আমার ছেলের নাম আজ এক প্রতীক হয়ে গেছে- মানবিকতার প্রতীক, সাহসের প্রতীক, শহীদের প্রতীক। আমি এটুকুই বলি- আমার ছেলে মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ স্বপ্ন দেখত এক মুক্ত বাংলাদেশের। আমি চাই তার রক্ত যেন বৃথা না যায়। এই দেশের তরুণরা যেন মুগ্ধের মতো সাহস করে দাঁড়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মানুষের অধিকারের পক্ষে।

শহীদ মুগ্ধ আমার ছেলে, আমার গর্ব। ●

অনুলিখন: তানভীর হাসান

রক্তস্রোতে নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম

নূরে আলম পিন্টু
বিশেষ প্রতিনিধি, ইনডিপেনডেন্ট টিভি

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সকালে ছয় বছরের শিশু জাবির ইব্রাহীমকে সঙ্গে নিয়ে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে রোডমার্চে যোগ দেয় তার মা। রাজধানীর উত্তরার সড়কে হাঁটার সময় দুপুরে খবর আসে- স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেছে। সড়কে তখন জনস্রোত; মুক্তির আনন্দে আত্মহারা জনতা। কিন্তু তখনও হাসিনার অনুগত পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল। একটি গুলি এসে জাবিরের কচি শরীরটাকে বিদ্ধ করে। কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরেও বাঁচানো যায়নি জাবিরকে। এমন সহস্রাধিক মানুষের রক্তের বিনিময়ে পতন হয় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার। কত মা-বাবা সন্তান হারিয়েছে, কত সন্তান বাবা-মা হারিয়েছে- কত আত্মত্যাগ!

একটু পেছনে ফিরে যাই। ২০২৪ সালের ৫ জুন সরকারি চাকরির কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে রায় দেন আদালত। এর প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ১ জুলাই থেকে যখন আন্দোলন পুরোদমে শুরু হয় তখন থেকেই গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে মাঠে ছিলাম। শুরু থেকেই কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবি তুলে ধরছিলাম। সেই সময় সমন্বয়কদের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ হতো, পাশাপাশি ছাত্রদলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ হতো।

১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। সেদিন চোখের সামনে দেখেছি নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার নৃশংস দৃশ্য। কয়েকটি মেয়ে বাঁচার জন্য বাসের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে গিয়েও তাদের মারধর করে হেলমেট বাহিনী।

এরপর সেখান থেকে আহত শিক্ষার্থীদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ছুটে যাই সেখানে। আমাদের চোখের সামনেই হাসপাতালে আহতদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ, যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। এমন বর্বরতা পৃথিবীতে কমই হয়েছে। সেই সময় চিকিৎসকদের ওপরও হামলা চালায় ফ্যাসিবাদের দোসররা। দুইজন চিকিৎসকের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দেওয়ার কারণে তাদের হুমকি দেওয়া হতো বলে জানিয়েছিলেন।

১৫ জুলাই বিকেল থেকেই ফজলুল হক মুসলিম হল, অমর একুশে হলের শিক্ষার্থীরা হলের ছাদ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। চোখের সামনে দেখছিলাম হলের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাত্রলীগ, যুবলীগের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ছাত্রদের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। পাশেই পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

সেদিনের ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে নামে। রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ এবং চট্টগ্রামে ছাত্রদলের ওয়াসিমসহ ৫ জনকে হত্যা করে হাসিনার অনুগত পুলিশ। সাড়ে ১৫ বছরের ভোটাধিকার-হরণ, গুম, খুন নিয়ে ক্ষুব্ধ জনতা যখন দেখলো মানুষকে পাখির মতো গুলি করে মারা হচ্ছে, শিশুদেরও হত্যা করছে হাসিনার অনুগত পুলিশ এবং আওয়ামী সন্ত্রাসীরা; তখন সবাই রাজপথে নেমে এলো। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষ অংশ নিলো ঐতিহাসিক এই গণঅভ্যুত্থানে। এসবের মধ্যেই ১৯ জুলাই থেকে গণমাধ্যমের ওপর নেমে আসে "সেন্সরশিপ"। ইন্টারনেট বন্ধ করে গণহত্যা চালানো হয়। একদিনেই হত্যা করা হয় ১৪৮ জনকে। কিন্তু নিহতদের প্রকৃত তথ্য কোনোভাবেই প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি গণমাধ্যমকে।

> *'একজন সাংবাদিক হিসেবে এর চেয়ে বড় অসহায়ত্ব আর কিছু হতে পারে না- আপনার হাতে সত্য আছে, অথচ তা বলার অধিকার নেই'*

আমি আন্দোলনের শুরু থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করছিলাম, তাই নেতৃত্বে থাকাদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনে অংশ নেওয়াদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্যই পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেইসব তথ্য নিউজরুম থেকে প্রকাশ করছিল না।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ১৯ জুলাই গুলিতে শহীদ হন মারুফ হোসেন। আমি দ্রুতই এই খবর পেয়ে যাই। সেদিন মারুফের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গ থেকে বের করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। পরে তাকে দাফনের জন্য পূর্ব বাড্ডায় নেওয়া হলে সেখানেও বাধা দেয় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা। এসব তথ্য আমি সেদিন পেলেও তা নিয়ে কোনোভাবেই প্রতিবেদন করতে দেওয়া হয়নি। সাংবাদিক হিসেবে এর চেয়ে বড় অসহায়ত্ব আর হয় না বলে সেদিন আমার মনে হয়েছিল। ঠিক একবছরের মাথায় শহীদ মারুফকে নিয়ে সম্প্রতি সেই প্রতিবেদন করেছি। গণঅভ্যুত্থানের সময় যা ঘটত তার তেমন কিছুই আসত না বেশিরভাগ টেলিভিশনের পর্দায়। যে সময়ে থাকার কথা ছিল ছাত্র-জনতার পাশে সেই সময়ে বেশিরভাগ টেলিভিশন চ্যানেল ব্যর্থ হয়েছে। লাইভ সম্প্রচার বন্ধ রাখা হয়েছিল বেশিরভাগ সময়। দিনশেষে প্রতিবেদনেও উঠে আসত না তেমন কোনো প্রকৃত চিত্র।

ইসিবি চত্বরে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। সেখানে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে বলছিল, "আমাদের ভাইদের খুন করেছে হাসিনা, প্রয়োজন হলে জীবন দেবো। তবু হাসিনাকে থাকতে দেবো না।" এতটুকু একটা বাচ্চার এই সাহস অনেককে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু সেই বক্তব্য প্রচারের সাহসটুকু নিউজরুমের ছিল না।

১৯ জুলাই আজিমপুরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এ সময় ব্যাংকার দুলাল মাহমুদ গুলিবিদ্ধ হয়। চোখের সামনেই মুহূর্তের মধ্যে একজন মানুষকে নিহত হতে দেখলাম। ভীষণ দুর্বিষহ ছিল সেইসব দিন। প্রতিদিনই এমন ঘটনার সাক্ষী হতাম। দিন শেষে রাতে ঘুমাতে পারতাম না। ক্ষমতার দম্ভে একের পর শিশুদের হত্যার দৃশ্য ভেসে উঠত চোখের সামনে!

গণঅভ্যুত্থানের সময় ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক সাইদুর রহমান ভাইসহ আমরা কয়েকজন গণমাধ্যমকর্মী প্রায়ই রাতে কারওয়ান বাজারে বসতাম। গণঅভ্যুত্থানের সময় যে যা তথ্য পেতাম সেটি নিজেদের মধ্যে শেয়ার করতাম। যেখানে যার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল; সেইসব তথ্য দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতাম।

৩ আগস্ট, শহীদ মিনারে একজন মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, "আমার ছেলে আন্দোলনে আছে। আমিও আছি। প্রতিরাতে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিচার চাই।" তার কিছুক্ষণ পরই দেওয়া হয় ফ্যাসিস্ট হাসিনার পদত্যাগের একদফা দাবি। এর একদিন পরই ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে ভারতে পালিয়ে যায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা। অবসান হয় সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের। মায়েদের কথা সেদিন সৃষ্টিকর্তা শুনেছেন। মুক্তির আনন্দে বিজয় উল্লাস; ছাত্র জনতার ঢল; সেটি ছিল আমার রিপোর্টিং জীবনের সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত। এই বিজয় এসেছে বৈষম্যহীন একটি দেশ গড়ে তোলার জন্য, এই বিজয় এসেছে গণমাধ্যমকে মুক্ত করার জন্য।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা

অধ্যাপক ড. শামীমা সুলতানা
বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ এক অপার স্বপ্ন ও সম্ভাবনার দেশ। ফ্যাসীবাদী আওয়ামী সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক দল ও জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্য দিয়ে একটি কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার বিশাল সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের জনতার অভূতপূর্ব বিজয় সূচিত হয়েছে। ভাবতে ভালো লাগে এ-আন্দোলনের সঙ্গে আমিও শুরু থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম এবং দৃঢ়ভাবে ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করিনি। ছাত্রজীবন থেকেই আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেকোনো ন্যায্য আন্দোলনে অগ্রভাগে থাকতে পিছপা হইনি। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হই। শৈশবে জিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমাকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তোলে। আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অকুণ্ঠ দেশপ্রেম ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃঢ় নেতৃত্ব আমাকে আশাবাদী ও কর্মতৎপর হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। দেশ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাও আমার চলার পথের পাথেয়। সেই দায়বদ্ধতা থেকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি আন্তরিকভাবে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আগে থেকেই আমি সোচ্চার ছিলাম। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার ছবি অফিসকক্ষ থেকে নামিয়ে ফেলার পর আমার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হতে থাকে। কিন্তু আমি সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করিনি। সময়ের প্রয়োজনে আমি প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিয়েছিলাম। এখন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি।

> *বাংলাদেশ এখন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে- একদিকে পতিত স্বৈরাচারের ভয়াবহ স্মৃতি, অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি। জনগণের ঐক্য ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাই হতে পারে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রধান চাবিকাঠি*

জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল ও জনগণের ঐক্য সবচেয়ে জরুরি। কারণ আমরা যদি নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিভাজন সৃষ্টি করি তাহলে মূলত লাভবান হবে পতিত স্বৈরাচারী শক্তি। তারা আবারও মাথ চাড়া দিয়ে উঠবে যেকোনো সময়; যদি আমরা নিজেরাই বিভক্ত হয়ে পড়ি। কারণ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর নিজস্ব ফসল নয়; বরং সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও ত্যাগের ফসল। এখন পুরো জাতি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখার জন্য উন্মুখ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কাজ হবে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ করে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা। কারণ ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে দেশ নানা ধরনের জটিলতায় পর্যবসিত হবে। দেশে গণতন্ত্রের চর্চা আরও সুদৃঢ় করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। গত ১৬ বছর মানুষ তার ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এখন সময় এসেছে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করার। মানুষকে তাদের ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। এ দেশের মানুষের কাছে ভোট একটি উৎসবের নাম। কিন্তু ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার ভোটকে আতঙ্কে রূপান্তরিত করেছিল। এ দেশের মানুষকে আবার ভোট উৎসবের পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে।

নির্বাচনি ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্য দিয়ে জনগণের মতামত প্রতিফলনের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে স্বৈরাচার জন্মের দ্বার বন্ধ করা সম্ভব হবে। কারণ বিগত, ১৬ বছর ধরে প্রহসনের নির্বাচন ও রাতের ভোটের মধ্য দিয়ে আওয়ামী ফ্যাসীবাদী শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তাই জনমতের ভিত্তিতে যদি সরকার গঠন করা যায়, যদি জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায় তাহলেই কেউ স্বৈরাচার হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না। কিন্তু আমরা যদি ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে বিভেদের রাজনীতিতে

ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন

ছবি: মেহেদি হাসান

ব্যস্ত থাকি তাহলে পতিত স্বৈরাচার আবার মাথ চাড়া দেবে যেকোনো সময়। আমরা যেন ভুলে না যাই, বিগত ১৬ বছরের সীমাহীন অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়নের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও তাদের অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মী এবং স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ ও গুপ্তঘাতক বাহিনী যে নৃশংসতা চালিয়েছিল তা কোনো সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। পাখির মতো গুলি করে নিরপরাধ মানুষ হত্যার পাশাপাশি হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনকারী ও নিষ্পাপ শিশুদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। স্বয়ং শেখ হাসিনার নির্দেশেই যে এসব খুনের ঘটনা ঘটেছে তা বিবিসিসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

এমনকি স্বৈরাচার হাসিনা যখন পদত্যাগ করেছে তখনও সাভার এলাকায় স্বৈরাচার বাহিনী হত্যা অব্যাহত রেখেছিল। সেদিন সাভারে শ্রাবণ, আলিফ, সাফুয়ানসহ অসংখ্য নাম না জানা মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ৫ তারিখের পর ভ্যানে করে পোড়ানো কতশত লাশ আমরা দেখেছি নানা গণমাধ্যমে। আমি জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি, আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। সেইসঙ্গে নিহত-আহতদের তালিকা এবং তাদের প্রতি সরকার যেন যথাযথ দায়িত্ব পালন করে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি। বৈষম্য দূর করার যে স্বপ্ন নিয়ে আমাদের স্বপ্ন সারথিরা রাস্তায় নেমেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণ হোক।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল অভাবিতপূর্ব। তাই সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন জরুরি। নারী তার শক্তি ও সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। নারীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আন্দোলনে গতিসঞ্চার ও সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে অবিশ্বাস্য ভূমিকা রেখেছিল। নারীর ন্যায্য অধিকার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। জুলাই আন্দোলনে নারীদের প্রতিরোধ ও নারীর ওপর সহিংসতার ছবিগুলো পুরো দেশের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল বলেই আন্দোলনে সাধারণ মানুষ জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের চাওয়াও খুব বেশি নয়। তারা শান্তিতে দুবেলা দু-মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের পছন্দের প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে চায়। তাই মানুষ যেন নির্ভয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে, সে ব্যবস্থা করা এখন সময়ের দাবি।

> *গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িতরা হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার করে দেশকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনি ব্যবস্থা, সাংবাদিকতা, আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়েছে পতিত স্বৈরাচার। এগুলোর মেরামত করা জরুরি*

প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা জরুরি। বিগত ষোলো বছরে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেছনে সরে গেছে। ফ্যাসিবাদী সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মহোৎসবে মেতে উঠেছিল। স্কুল থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে জাতিকে মেধাহীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তারা। পাঠ্যবই নিয়েও নানা ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক কাজে মেতে উঠেছিল তারা। নিজেদের লোকদের দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এসব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। পাঠ্যক্রমে নানা ধরনের উদ্দেশ্যমূলক বিষয় তারা যোগ করেছিল। ইতিহাস বিকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যই এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এতে দেশ-জাতির ন্যূনতম কোনো লাভ হয়নি; বরং ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছিল। সহিংসতার কারণে অনেক নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী জীবন হারিয়েছিল। স্বৈরাচারী শাসনকে অব্যাহত রাখতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরিতে ছাত্রলীগকে দানবে পরিণত করা হয়েছিল। গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িতরা হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার করে দেশকে পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনি ব্যবস্থা, সাংবাদিকতা, আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিয়েছে পতিত স্বৈরাচার। এগুলোর মেরামত করা জরুরি। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মধ্য দিয়ে আগামীতে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে তাদের এসব বিষয়ে দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ দেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। তাদের আরও বেশি অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে হবে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতায় স্বৈরাচার বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করতে হবে। দেশের প্রকৃত মালিক এ দেশের জনগণ। শাসনশ্রেণিকে এ কথাটি ভুলে গেলে চলবে না। তাই জনগণের মতামতের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। শাসকদের মতামতকে জনগণের মতামত বলে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জনসমর্থন ছাড়া ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চিন্তা করলে জনগণই একসময় তা প্রতিহত করতে রাজপথে নেমে আসে। তাই সব কাজের ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণিকে জনগণের কথা মাথায় রাখতে হবে। জনগণের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে কাজ করলেই সম্ভব হবে স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণ। ●

গ্রাফিতি ছবি: সংগৃহীত

জুলাইয়ের বৃক্ষ

মো. আতিকুর রহমান
আহ্বায়ক, বাকৃবি ছাত্রদল

"যতক্ষণ না আলো সবার পাতায় পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আলো কারো একার নয়।" সাতচালা বুঝতে পারল, এক ভয়ংকর কিছু গজিয়ে উঠছে। সে তার লতার বাহিনী নামাল। গুজব ছড়ালো–"জুলাইবৃক্ষ পোকায় আক্রান্ত, তার পাশে থাকলে তোমারাও মরে যাবে

একটা সময় ছিল, যখন এই ভূখণ্ডে এক বিশাল বাগান ছিল। নাম ছিল আলোকবাগান। শত সহস্র বৃক্ষ, ফল, ফুল, পাখি আর সুবাসে ভরা সেই বাগান এক সময়ের গর্ব ছিল এই অঞ্চলের। এই বাগানে একদিন জন্ম নেয় এক ব্যতিক্রমী বৃক্ষ–জুলাইবৃক্ষ। সে ছিল একদম সাধারণ চারা, অন্য সব গাছের মতোই। কিন্তু জন্ম থেকেই তার চোখে ছিল বিদ্রোহের ছায়া, বুকের ভেতর আগুন, আর শেকড়ে ছিল সত্য আর ন্যায়ের সন্ধান।

বাগানের শাসক ছিল এক লোভগুরু ফলজ গাছ, নাম তার সাতচালা। বাইরে থেকে সে ছিল শান্ত-গম্ভীর, কিন্তু ভেতরে সে ছিল পচনধরা, শোষক, লোভী ও কূটনৈতিক। তার শিকড় ছিল সেচতন্ত্র আর সার-সরবরাহের মালিকদের সাথে জড়িত, যারা শুধু নিজেদের খাইয়ে যেত, কিন্তু বাকি সব গাছের মাটি শুকিয়ে দিত। আলোকবাগানের একটা নিয়ম ছিল– শুধু সাতচালা আর তার বংশধর গাছরাই রোদ পাবে, পানি পাবে, বাকিরা ছায়ায় পড়ে শুকিয়ে যাবে। জুলাইবৃক্ষ এটা মেনে নিতে পারল না। সে প্রশ্ন করল- "আমরা কি শুধু জন্মেছি শুকিয়ে যাওয়ার জন্য? আমাদের পাতায় কি রোদ লাগার অধিকার নেই? আমাদের শিকড়ে কি পানির প্রয়োজন নেই?" এই প্রশ্ন ছিল বাগানের প্রথম বিদ্রোহ।

প্রথম বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে। পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, এই জুলাইবৃক্ষ একা ছিল না। তার আশপাশে আরও কিছু তরুণ চারা মাথা তুলেছিল। তাদের কেউ কেউ ছিল স্বপ্নচারা, কেউ সাহসচারা, কেউ বেদনা-বৃক্ষ। সবাই ছিল ক্ষুধার্ত–নয় খাদ্যের জন্য, বরং ন্যায়ের জন্য, সম্মানের জন্য। তারা গড়ে তুলল এক পাতাঝরা সভা, যেখানে তারা রাতে আলো জ্বালিয়ে নিজেদের কথা বলত। কেউ বলত–"আমি বড় হতে চাই না, শুধু আলো চাই।" কেউ বলত–"আমার ছায়া দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিজের শরীরই শুকনো।"

জুলাইবৃক্ষ বলত– "যতক্ষণ না আলো সবার পাতায় পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আলো কারো একার নয়।" সাতচালা বুঝতে পারল, এক ভয়ংকর কিছু গজিয়ে উঠছে। সে তার লতার বাহিনী নামালো। গুজব ছড়ালো–"জুলাইবৃক্ষ পোকায় আক্রান্ত, তার পাশে থাকলে তোমারাও মরে যাবে।" কিন্তু রটে রটে বটে যায় না। বরং বাতাসে ছড়িয়ে গেল এক নতুন সুবাস। এক নতুন নেশা। স্বাধীনতার গন্ধ। তবুও শোষণের ছায়া বড় ঘন। লতার ফাঁদে পড়ে স্বপ্নচারা মরে গেল, বেদনা-বৃক্ষ হারিয়ে গেল মাটির গভীরে। তবে জুলাইবৃক্ষ দাঁড়িয়ে রইল। তখনকার একটা দিন ছিল– জুলাইয়ের ৩৬তম দিন, আকাশ কালো, বাতাস থমথমে। সাতচালার দল জুলাইবৃক্ষকে উপড়ে ফেলতে এলো। শিকড় কাটতে লাগল, গুঁড়ি কেটে ফেলার চেষ্টা করল। তারা জানত না, জুলাইবৃক্ষ তার ডালপালা দিয়ে শুধু ছায়া দেয় না, সে তার শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে আশপাশের চারদিকে, গভীর মাটির ভেতরে। সেই দিনে– মাটি কাঁপল। চুপচাপ থাকা পুরনো সব গাছ হঠাৎ কেঁপে উঠল। তাদের ভেতর জমে থাকা রক্ত, কষ্ট, অভিমান জেগে উঠল। সাহসচারা আবার জেগে উঠল নতুন কুঁড়িতে। পাতাঝরা সভার সদস্যরা রোদ উপেক্ষা করে একে একে গজিয়ে উঠল। সব গাছ একসাথে বলল– "আমরাও আলো চাই।" বাগানে ছড়িয়ে পড়ল ঝড়। জুলাইবৃক্ষ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল– "আজ না হয় আলো হলো সবার। আজ না হয় বৃষ্টি ভাগ করে পড়ল পাতায় পাতায়।" শোষকরা পালিয়ে গেল। সাতচালা পচে মাটিতে মিশে গেল।

বাগানজুড়ে এক নতুন নিয়ম এলো– যার যতটুকু প্রয়োজন, সে ততটুকু পাবে। যার যতটুকু সাধ্য, সে ততটুকু দেবে। জুলাইবৃক্ষ তখন আর শুধু একটা গাছ ছিল না। সে ছিল এক প্রতীক– এক আন্দোলনের, এক শেকড়ের, এক সমতার। তার নাম দিয়ে এক নতুন ইতিহাস লেখা হলো: "জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান"। আজও যখন বাতাসে নতুন সুবাস আসে, যখন একটা চারা প্রশ্ন তোলে– "কেন আমি ছোট?" তখন পুরনো গাছেরা ফিসফিস করে বলে– "তুমি জুলাইবৃক্ষের উত্তরাধিকারী। তুমি আলো চাইতেই পারো।" ●

কওমি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল সুসংগঠিত

মুফতি জামিল সিদ্দিকী
সভাপতি, বাংলাদেশ কওমি ছাত্র ফোরাম

জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার লক্ষ্যে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমেছিল। এই আন্দোলনে কওমি মাদ্রাসা অঙ্গনের ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-উলামা ও তাওহিদি জনতার ভূমিকাটি ছিল একদম ভিন্নমাত্রিক, অনুপ্রেরণাদায়ী এবং সময়োপযোগী।

আন্দোলনের সূচনায় কওমিদের কোনো প্রত্যক্ষ স্বার্থ না থাকলেও তারা ন্যায়ের পক্ষের মানুষ হিসেবে মৌন সমর্থন জানান। কওমি আলেমরা বয়ান, নসিহত ও নেতৃত্বের মাধ্যমে তরুণদের মাঝে ইসলামি চেতনা ও সাহস জাগিয়ে তোলেন। এটি আন্দোলনের ভেতর আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক ভিত্তি এনে দেয়।

জুলাইয়ের শুরু থেকেই কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে মৌন ও নৈতিক সমর্থন দেয় কওমি ধারার দল ও মতের দায়িত্বশীলরা। আমরা অনেকেই শুরু থেকে আমাদের মতো করে মাঠে ছিলাম। তবে ১৪ জুলাই রাত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের ওখান থেকে যে আন্দোলন শুরু হয় এবং ওই রাতে যে প্রতিরোধ করা হয় সেখান থেকেই ব্যাপক আন্দোলনের মাত্রা যুক্ত হয়। রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে কওমি ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ১৭ জুলাই ঢাকাসহ পটিয়া ও হাটহাজারীর ছাত্রদের রাজপথমুখী হওয়া, ১৯ জুলাই বাদ জুমা দেশব্যাপী গণমিছিলে অংশগ্রহণ প্রতিরোধ আন্দোলনকে নতুন শক্তি দেয়।

> *‘কওমিদের বয়ান, নসিহত ও নেতৃত্ব তরুণদের মাঝে ইসলামি চেতনা ও সাহস জাগিয়ে তোলে, যা আন্দোলনের আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে দেয়’*

বিশেষত যাত্রাবাড়ী এলাকায় কওমি ছাত্রদের সুশৃঙ্খল মিছিল ছিল এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ কওমি ছাত্র ফোরামের সদস্যরা ঢাকার উত্তরা, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, পল্টন ও যাত্রাবাড়ীসহ সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমে আসেন। এরপরে আন্দোলন কিছুটা থেমে গেলেও যাত্রাবাড়ী অঞ্চল ব্লকেড ছিল। এরপর ২১ তারিখ থেকে আমরা পল্টনসহ বিভিন্ন জায়গায় মাঠে থাকি এবং ৩০ জুলাইয়ের পরে সারাদেশে এক যোগে কওমি ছাত্র-শিক্ষক রাজপথে নেমে আসেন। আমি নিজেও ১৮ জুলাই ও ২ আগস্ট আহত হই। ৩ আগস্ট কওমির সব অংশ সক্রিয়ভাবে প্রকাশ্যে রাজপথে নেমে পরে। ৪ আগস্ট শীর্ষ আলেমরাও বায়তুল মোকাররম থেকে একযোগে নেমে শাহবাগমুখী হয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। এভাবেই ৫ আগস্ট হাসিনা পলায়ন পর্যন্ত রাজপথে সংগ্রাম চলতে থাকে। হাসিনা পতনের পরও ওই রাত পর্যন্ত যাত্রাবাড়ীতে গুলি হামলা ও হত্যা চলমান থাকে, যেখানে সবচেয়ে বেশি হতাহত হয় কওমির ছেলেরা। এই আন্দোলন চলাকালীন ৫০ জনের বেশি কওমি ছাত্র শহীদ হন এবং বহু আহত ও এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অন্য রাজনৈতিক শক্তির তুলনায় কওমি অঙ্গনের আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ, সংগঠিত ও আদর্শভিত্তিক। মসজিদ, মাদ্রাসা, তালিম ও জুমার খুতবায় আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়, যা জনমনে ব্যাপক সাড়া তোলে। তারা প্রমাণ করেন- সত্য ও ন্যায়ের কণ্ঠস্বর হতে কোনো রাজনৈতিক ব্যানার লাগে না, লাগে ঈমানী স্পষ্টতা ও চিন্তা-প্রকাশের সাহস। কওমি অঙ্গনের রাজপথে নামা ছিল নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে। তবে আজ যখন একটি বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে, তখন তাদের পক্ষ থেকে কিছু যৌক্তিক দাবি উঠে এসেছে। কওমি সনদের পূর্ণ কার্যকারিতা, দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমতুল্য স্বীকৃতির বাস্তবায়ন, কওমি ছাত্রদের জন্য আত্মনির্ভরশীলতা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ইসলামি শিক্ষা ও মূল্যবোধে গঠিত একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

জুলাই অভ্যুত্থানে কওমি ছাত্র-আলেমদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে- আমরা শুধু মাদ্রাসার চার দেয়ালে আবদ্ধ নই, বরং দেশের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঈমানদের কণ্ঠস্বর। এই অংশগ্রহণ একটি মৌলিক বার্তা দেয়- “আমরা প্রস্তুত ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্বে জাতিকে এগিয়ে নিতে।”

এই অভ্যুত্থানে কওমি অঙ্গনের ভূমিকা কেবল এককালীন অংশগ্রহণ ছিল না; বরং এটি ছিল এক ঈমানী চেতনায় গঠিত ন্যায়ের বিপ্লবের ভিত্তিপ্রস্তর। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গঠনে এই চেতনার ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা চাই- নতুন বাংলাদেশে আর কোনো বৈষম্য থাকবে না। থাকবে ন্যায়, ইনসাফ, এবং ইসলামি মূল্যবোধে গঠিত একটি সম্মিলিত জাতিসত্তা। ●

ছবি: মেহেদী হাসান

রক্ত ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হয়নি

আশরাফুল আলম
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল

২০২৪ সালের আন্দোলন ছিল মূলত সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক বৃহৎ গণপ্রতিরোধ। শিক্ষিত বেকার তরুণদের মধ্যে দীর্ঘদিনের হতাশা ও ক্ষোভ জমে ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো ন্যায্য সমাধান না আসায় নামতে হলো রাজপথে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ থেকে মফস্বল পর্যন্ত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে কুষ্টিয়া শহরের একটি মেসে থাকা অবস্থায় আমি এই আন্দোলনে অংশ নিই। ১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার, আন্দোলন চলছে। আন্দোলনে না গিয়ে মেসে বসে থাকা তখন কাপুরুষতা বলে মনে হয়েছিল। দু-দিন আগে ১৬ জুলাই আন্দোলনে যাওয়ার সময় যখন মেসের সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম, তখনই খবর পেলাম রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাইদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। আমি আমার রুমমেট হৃদয়কে বললাম, "রক্ত ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হয়নি।"

> *রংপুরে আবু সাঈদের রক্ত দেখেই বুঝেছিলাম, এই লড়াই আর পেছনে ফেরার নয়। পুলিশের গুলি, রাবার বুলেট, টিয়ারশেল- কিছুই থামাতে পারেনি আমাদের*

তার আগে থেকেই দিনগুলো কাটছিল আন্দোলন করে, ফেসবুকে পোস্ট করে, হ্যাশট্যাগ দিয়ে। সকাল থেকে রাত অবধি এটাই ছিল রুটিন। ১৮ জুলাই সকালেই বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পেলাম কুষ্টিয়ায় আজ আন্দোলনের কর্মসূচি রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলাম। রংপুরে আবু সাইদের মৃত্যু সারাদেশকে বেদনাহত করেছে। আন্দোলনে যাচ্ছি জানাতে বাসায় কল দিলাম। মা কোনোভাবেই রাজি নয়। আমি বললাম- "মা, তুমি যদি যেতে না দাও, তাহলে তোমার ছেলেকে চুড়ি পরিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখো"। মা বললেন- "তাই রাখবো"। আমি শুনছিলাম না। মা বললেন- "তুই যদি যাস, তাহলে আমাকেও নিয়ে যা"। আমার জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত মা রাজি হলেন। তিনি বললেন- "মিছিলে সামনের দিকে যাস না, গুলি করবে"। বললাম, "ঠিক আছে"।

আমার বান্ধবী জান্নাতুল ফেরদৌস আশা কাস্টম মোড়ে থাকে। সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা মাহবুব উল আলম হানিফের বাসা। আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে গুন্ডা ও ছাত্রলীগের বাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছিল সেখানে। আশা আমাকে মোবাইল ফোনে বললো- "সাবধানে আসিস আন্দোলনে। লীগের ছেলেপেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রেডি হয়ে আছে"।

আমি, সজীব ভাই, ইংরেজি বিভাগের সাকিল ও তার কয়েকজন বন্ধুসহ আমরা মজমপুরের দিকে রওনা হই। সেখান থেকেই মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল। আমি জানালার পর্দা লাগানোর একটি পাইপ খুলে নিলাম আক্রমণ ঠেকানোর জন্য। হাসপাতাল মোড় হয়ে সাদ্দাম বাজার পেরিয়ে আমাদের অন্য গ্রুপের সঙ্গে মজমপুরে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বের হওয়ার প্রতিটি পথেই পুলিশ আগেই অবস্থান নিয়েছিল; জেলখানা মোড়, কলেজ মোড় ও বকচত্বর-সবখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে মেসে থাকা প্রায় এক থেকে দেড় হাজার ছাত্র এসে জমায়েত হলো। চারপাশে পুলিশ অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে। আমরা পরিকল্পনা করলাম মিছিল নিয়ে কুষ্টিয়া-খুলনা

ছবি: মেহেদি হাসান

ছবি: মেহেদি হাসান

> *“কোটা না মেধা, মেধা মেধা”; “আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই”; “তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার”*

মহাসড়কে উঠবো, কিন্তু মিছিল হাইওয়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছোড়া শুরু করলো। জুলাই আন্দোলনে সেদিনই প্রথম টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছোড়া হয় কুষ্টিয়ায়। আমরা খানিকটা পিছু হটে আবার একত্রিত হলাম। মিছিল শুরু করলাম। সেদিন মিছিলের স্লোগানগুলো ছিল- “কোটা না মেধা, মেধা মেধা”; “আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই”; “তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।”

দফায় দফায় চেষ্টা করেও মহাসড়কে উঠতে পারলাম না। পুলিশ আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলো। গুলিতে কিছুটা পিছু হটে আমরা কুষ্টিয়া সরকারি হাসপাতালের সামনে আশ্রয় নিলাম। ভেবেছিলাম পুলিশ এখানে আসবে না, কিন্তু তারা হাসপাতালের সামনে এসেও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। পরে যখন পুলিশের গাড়ি হাইওয়েতে যায়, তখন আমরা পুলিশের গাড়ি আসার পথ বন্ধ করার জন্য রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তার মাঝখানে এনে রাখি।

আমরা স্লোগান দিচ্ছিলাম আর পুলিশ গুলি, রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল চালাচ্ছিল। আমার পায়ে কয়েকটি রাবার বুলেট লাগে। আগে কখনো টিয়ারশেল দেখিনি, কেবল নাম শুনেছি। এবার বাস্তবে বুঝলাম গ্যাসের যন্ত্রণা কেমন। হাত দিয়ে মুখ চেপে রাখলেও গ্যাসের তীব্রতা সহ্য করা যাচ্ছিল না। চোখ জ্বালা করছিল, মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেদিন মিছিলে গিয়ে দেখা হয় সালেকের সঙ্গে। সে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। সে ছাড়াও সেদিন আমার পরিচিত-অপরিচিত আরও অনেকে আহত হন। কয়েকজনকে কুষ্টিয়া সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেদিন অনেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ আমার আত্মীয় না, কেউ আমার পরিচিত না, সবার শুধু একটাই পরিচয়- কোটার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী। তারা কেউ আগুন জ্বালাতো, কেউ টুথপেস্ট এনে দিতো মুখে লাগানোর জন্য, কেউ পানি খাওয়াতো, কেউ টিস্যু এগিয়ে দিতো। এই সংহতিই ছিল আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে রাবার বুলেট আমার শরীরে লাগে, আমি দৌড়াতে গিয়ে ছিটকে পড়ি। রাফি (আমার বন্ধু) ফোন করে জানতে চায় খবর। কেউ তাকে বলেছিল আমি মারা গেছি। “তুই ঠিক আছিস? আমি ভাবছিলাম তুই মরে গেছিস ভাই!” ওর কণ্ঠে ছিল কাঁপা কান্না। আমি বললাম- “না রে, আমি বেঁচে আছি। আন্দোলন চলছে, চলবে”।

সেদিন প্রায় এক হাজারেরও বেশি মানুষ অনেক চেষ্টা করেও হাইওয়েতে উঠতে পারিনি। তবে এটি আন্দোলনের স্পিডকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় শুনলাম, আমাদেরই আরেক গ্রুপের আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলি চালিয়েছে। সেখানে শহীদ হন দুজন শিক্ষার্থী। চোখের কোণে অজান্তে অশ্রু চলে আসে। মনে হলো, আমি যদি তাদের একজন হতাম!

এরপর থেকে ৫ আগস্ট বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজপথে লড়াই সংগ্রাম করেছি। যদিও আন্দোলন প্রথম দিকে ছিল কোটা সংস্কারের, তবুও মনের দৃঢ় কামনা ছিল খুনি হাসিনার উৎখাত। আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, আমরা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ২০২৪ সালের সেই গণ অভ্যুত্থান আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের অধ্যায় হয়ে থাকবে। গর্বের সঙ্গে বলতে পারি- আমি সেই ছাত্র, যাকে গুলি, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট থামাতে পারেনি। আমি সেই সন্তানের প্রতিনিধি, যার মা বলেছিল- “তুই গেলে আমাকেও নিয়ে চল”। আমি সেই বন্ধু, যার বেঁচে থাকার খবর শুনে আরেক বন্ধু কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। এই ইতিহাস শুধু আমার নয় এটা একটি প্রজন্মের সম্মিলিত প্রতিরোধের স্মারক। ●

“চোখ হারিয়েছি, কিন্তু আশা হারাইনি”

মোহাম্মাদ আল মিরাজ
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল

ঢাকার ফকিরাপুলে পুলিশের গুলিতে এক চোখ হারান মিরাজ, অন্য চোখেও ঝাপসা দেখেন। চিকিৎসার দীর্ঘ লড়াইয়ের পরেও শরীরে ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে। তবে মিরাজের মনোবলে কোনো আঁচড় পড়েনি

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ অথচ গর্বের দিন। সেদিন ছিল শুক্রবার, জুমার নামাজের পর ফকিরাপুল মোড়ে অবস্থান নিই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির ভাই ও ঢাকা মহানগর যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়ন ভাই। আমরা পল্টন-ফকিরাপুল এলাকায় মিছিল করছিলাম।

ফকিরাপুল মোড়ে অবস্থান করার সময় দেখি নয়া পল্টন থানার পুলিশ দুই দলে ভাগ হয়ে আমাদের দিকে টিয়ারশেল আর ছররা গুলি ছুড়ছে। বিকেল ৪টার দিকে এক দফা হামলার পর আমরা আবারও মিছিল করি। মিছিলটি যখন সামনে এগোয়, তখন হঠাৎ দেখি মতিঝিলের এডিসি গোলাম রোহানী আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। অন্য পুলিশরা গাড়িতে উঠে যেতে যেতে গুলি চালায়। একটি গুলির শব্দে আমার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। আমি শুধু চিৎকার করে বলছিলাম-

“ভাই, আমার চোখে গুলি লাগছে!” নয়ন ভাই সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেন। আমাকে ইসলামি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমার বুক থেকে ৩০-৪০টি বুলেট বের করা, হয় কিন্তু পায়ে থাকা কিছু বুলেট তখনও থেকে যায়। জিন্স প্যান্ট থাকায় পায়ে বেশি বুলেট ঢুকতে পারেনি।

হাসপাতালে চিকিৎসকরা চোখ পরিষ্কার করলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন- তাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। তখন আমরা ছুটে যাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে দেখি লাশের সারি, বিশৃঙ্খলা, আর নিরুত্তর চিকিৎসাব্যবস্থা। সেখানে চোখের চিকিৎসা হবে না- এই কথা শুনে আবার ছুটে যাই চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতালে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে পৌঁছানোয় চিকিৎসা হয়নি সেদিন। ব্যথা আর আতঙ্কে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভয় ছিল পুলিশ আবার ধরে নিয়ে যায় কিনা। ২০ জুলাই আমার চোখে অস্ত্রোপচার হয়। চিকিৎসক জানালেন- ডান চোখে আর কিছুই দেখা সম্ভব না, রেটিনা ছিঁড়ে গেছে। আর বাম চোখে ৩০-৪০% দেখা যাবে। এ কথা শুনে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। চোখের পানি আর কান্না আটকে রাখতে পারিনি।

সেদিনই আমি চলে যাই আমার বোনের বাসায়। দিনের পর দিন ব্যান্ডেজ বাঁধা চোখে পড়ে ছিলাম। ১৫ দিন পর আবার চেক-আপে যাই, তখন ডাক্তারদের মুখে শুনি একই আশাহীন বার্তা। ৫ আগস্ট, যেদিন স্বৈরাচার হাসিনা পালিয়ে গেল, সেদিন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। দুলাভাই আর বোন বললেন- সবাই রাস্তায়, আনন্দ মিছিল করছে। কিন্তু আমি দেখতে পারলাম না। সেই দিনের আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম না।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমাকে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর পাঠিয়েছিল। দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। মির্জা আব্বাস ভাই ও তার স্ত্রী সিঙ্গাপুরে আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন। হাবিব-উন-নবী সোহেল ভাই, এ্যানি ভাই, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দ সবাই পাশে ছিলেন। সিঙ্গাপুরে গিয়ে বাম চোখের বুলেট অপারেশনে বের করা হয়। ডান চোখে এখনও একটি বুলেট আছে। যদি সেটা বের করি, চোখের আকৃতি নষ্ট হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ডাক্তাররা। বাম চোখ দিয়ে এখন ঝাপসা দেখি- তবুও দেখি। নিজের কাজগুলো কিছুটা করতে পারি, এটাই এখন বড় প্রাপ্তি। আমি ‘এ ক্যাটাগরি’র একজন জুলাইযোদ্ধা। কারও ব্যক্তিস্বার্থে নয়, আমি দেশের স্বার্থে আন্দোলনে ছিলাম। কেউ যদি নিজের সুবিধার জন্য পুরো জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে চায়, সেটি আমি মেনে নিতে পারি না। এটি ছিল গণআন্দোলন, এটি ছিল জনতার জাগরণ। আমি বিশ্বাস করি- আমাদের নেতা তারেক রহমান বাংলাদেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। বাংলাদেশকে পথ হারাতে দেবেন না।

আমি স্বপ্ন দেখি- একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। আমার চোখ গেছে, কিন্তু স্বপ্ন যায়নি। এই স্বপ্নই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ●

অনুলিখন: নাঈম ইসলাম সংগ্রাম

হাসপাতাল থেকে রাজপথ

ডা. মমি আনসারী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ ছাত্রদল

১৫ জুলাই, ২০২৪; সেদিন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার লাঠিয়াল বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। সেদিন মেয়েরাই আক্রান্ত হয়েছিল বেশি। আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি ছবি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। খবর পেয়েই তাৎক্ষণিকভাবে বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম ভাইসহ আমরা কয়েকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে যাই চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য। হাসপাতালের চারপাশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি থাকায় গ্রেপ্তার এড়াতে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহতদের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাই আমরা। কাকরাইলে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আহতদের এক্স-রে, এমআরআই করিয়েছি। যারা বেশি আঘাতপ্রাপ্ত ছিল তাদের হাসপাতালে ভর্তি করিও ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলেও তথ্য গোপন করে সেদিন তাদের "সড়ক দুর্ঘটনায়" আহত বলে ভর্তি করি।

বেশিরভাগ আন্দোলনকারীর চিকিৎসার সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন ডা. রফিক ভাই। সেদিন হাসপাতাল থেকে বিএনপির পার্টি অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ছাত্রদলের সভাপতি রাকিব ভাই, সাধারণ সম্পাদক নাসির ভাই, আফসান ভাই, শ্যামল মালুম ভাই ও আমান ভাই মিটিং করছেন। আমার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন ভাই প্রবেশ করে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যেকোনো উপায়ে রাতে ক্যাম্পাসে মিছিল করতে হবে। তারপর আমার কাছ থেকে তারা হাসপাতালের আহত রোগীদের খোঁজ খবর নেন। আমাকে আবার হাসপাতালে পাঠানো হয়। যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফারহান আরিফ ভাইও আমাদের সঙ্গে যায়। হাসপাতালে গিয়ে দেখি বর্তমান এনসিপি নেতা আখতার বসে আছেন। মোবাইল ফোনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির ভাইয়ের সঙ্গে আখতারের যোগাযোগ করিয়ে দেই।

১৮ জুলাই আমি ছিলাম সায়েন্সল্যাবে সিটি কলেজের সামনে। সকাল থেকে রাস্তায় নামার চেষ্টা করি। পুলিশ প্রশাসনের জন্য কোনভাবেই আমরা একত্রিত হতে পারছিলাম না। ৪-৫ জন একসঙ্গে হলেই পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছিল। সিটি কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রীসহ আমরা পপুলার হাসপাতালের ভেতরে অপেক্ষা করতে থাকি। একপর্যায়ে আইডিয়াল কলেজের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ আসতে থাকে। আমরা তখন পপুলার থেকে বের হয়ে মূল সড়কে চলে আসি। নিউমার্কেটের দিক থেকে লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীরা আসে; তাদের সঙ্গে আমাদের ধাওয়া পালটা ধাওয়া চলতে থাকে। ল্যাবএইড হাসপাতালের দিক থেকে পুলিশ টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড, গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমার হাতে ছররা গুলি লাগে। আমরা আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে স্টার কাবাবের সামনে কোনো একটা ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা মিছিল নিয়ে আসে। ঝিগাতলা থেকে লীগের সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করতে থাকে। আমরা চতুর্মুখী সংঘর্ষে জড়িয়ে যাই। কয়েকজন সিটি কলেজের পিছনের কয়েকটি বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশ তাদের খুঁজে খুঁজে গ্রেপ্তার করে।

২০ জুলাইয়ের পর আমি আর বাসায় থাকিনি। একেকদিন একেক জায়গায় থেকেছি। ২২ জুলাই ছিলাম কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শিমুল ভাইয়ের বাসায়। আমরা সেদিন পরিকল্পনা করছিলাম আন্দোলন কীভাবে আন্দোলন আরও বেগবান করা যায়। এমন সময় খবর পেলাম নাহিদ ইসলামকে পূর্বাচলে কারা যেন হাত পা চোখ বেঁধে ফেলে রেখে গেছে। তাকে ধানমন্ডিতে গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে চিকিৎসক পরিচয়ে আমি গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে গেলাম। আমি হাসপাতালে প্রবেশ করতেই বুঝলাম পরিস্থিতি খুবই থমথমে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হাসপাতাল ঘেরাও করে রেখেছে। সেসময় আমার বুকে সাহস থাকার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, পুলিশ বাধা দিলে পরিচয় দেবো- "আমি ডাক্তার"। রুমে ঢুকে নাহিদ ইসলামকে পরিচয় দিলাম- "আমি ছাত্রদল করি"। মোবাইল ফোনে নাহিদের সঙ্গে বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলামের যোগাযোগ করিয়ে দিলাম। নাহিদকে আশ্বস্ত করলাম এই হাসপাতাল নিরাপদ মনে না করলে আমাদের পরিচিত অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা যাবে। নাহিদ বলল, পরে জানাবে।

পরের দিন রফিক ভাই নাহিদ ইসলামের খোঁজ নেওয়ার জন্য আমাকে আবার হাসপাতালে যেতে বললেন। কয়েক প্রকার ফল নিয়ে গেলাম। চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সার্বিক সহযোগিতা করলাম। হাসপাতালে সাংবাদিক এহসান মাহমুদকে দাঁড়ানো দেখলাম। তাকে রুমে যেতে দিচ্ছিল না। এহসান মাহমুদ একজনের কাছে তার মোবাইল ফোন পাঠিয়ে দিল নাহিদ ইসলামের বর্তমান পরিস্থিতির ছবি তুলে আনার জন্য। পরদিন রফিক ভাই গ্রেপ্তার হলেন। বিপদের আশঙ্কায় আমি মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে ফেলি। রফিক ভাই একজনের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলেন আমি যেন ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যাই। তবে আমি ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাইনি। উল্টো মায়ের একটা পুরাতন মোবাইল ফোনে নতুন সিম ঢুকিয়ে সবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি।

২ আগস্ট শহীদ মিনারে মেডিকেল শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আমি স্লোগান ধরি- "এক দুই তিন চার, শেখ হাসিনা স্বৈরাচার"; "আমার ভাই মরলো কেন? খুনি হাসিনা জবাব চাই"; "ছোট্ট রিয়া কবরে, খুনি কেন বাহিরে"; "সেনাবাহিনী দিয়ে আন্দোলন, বন্ধ করা যাবে না"। আমার দেওয়া কিছু স্লোগানের ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। সেদিনের সমাবেশে পুলিশ আমাদের মাইক ব্যবহার করতে দেয়নি। সমাবেশে যেতেও হয়েছিল অনেক রাস্তা ঘুরে। ভয় আর আতঙ্কের মধ্যেও সেদিন চিকিৎসক সমাবেশ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে আমি ভেবেই নিয়েছিলাম শহীদ মিনার থেকে বের হওয়ার সময় গ্রেপ্তার হতে পারি। যদিও ভাগ্যসুপ্রসন্ন ছিল।

এরপর আগস্টের ৩ তারিখ শহীদ মিনার থেকে "এক দফা" ঘোষণা করা হয়। সেই কাঙ্ক্ষিত এক দফা- "স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পদত্যাগ"। ৪ তারিখ আমি ছোটভাইদের নিয়ে ধানমন্ডি-ঝিগাতলার দিকে ছিলাম। আমরা ছাত্রজনতা রাস্তায় পড়ে থাকা ইট-পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে মারতে থাকি। অপরদিক থেকে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী মুহুর্মুহু গুলি-ককটেল ছুড়তে থাকে। আমরা স্টার কাবাবের দিক থেকে ঝিগাতলার দিকে এগোতে থাকি। সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে আবার পিছিয়ে যাই। এভাবে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ চলতে থাকে।

একপর্যায়ে ছোট ভাই তাসিন এর কপালে গুলি লাগলে প্রথমে তাকে ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেলে তাসিনের নাম, পরিচয় গোপন করে নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গুলি বের করি। ডিজিএফআই, এনএসআইসহ গোয়েন্দা সংস্থার লোক দিয়ে সেদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গিজগিজ করছিল। আহত কেউ হাসপাতালে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও করে রাখছিল। ৪ আগস্ট ঝিগাতলার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সেদিন ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে দেখি মানুষের ভয়াবহ অসহায় অবস্থা। কারো হাত-পা থেঁতলানো, কারো সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। মাথায়, চোখে, বুকে গুলি খেয়ে কেউ কেউ পড়ে আছেন স্ট্রেচারে।

সেদিন বিকেল নাগাদ ঘোষণা আসে "মার্চ টু ঢাকা" ৬ তারিখের পরিবর্তে ৫ তারিখ। যখন এই ঘোষণা আসে তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে। শহীদ মিনার থেকে ৩টি লাশ নিয়ে একটি মিছিল সেই সময় শাহবাগের দিকে যায়। সেখানে আবার শাহবাগ থানা থেকে পুলিশের আক্রমণে আরও ৩-৪ জন শহীদ হন। শাহবাগ সেদিন রণক্ষেত্রে পরিণত ছিল। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা নিজেদের জীবন বাজি রেখে পুলিশ এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী আওয়ামী বাহিনীর সঙ্গে খালি হাতে লড়াই চালিয়েছিল। সেদিন বাসায় না গিয়ে পিজি হাসপাতালের পেছনে শিমুল ভাইয়ের বাসায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি শাহবাগ থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম এবং ঢাকা কলেজের তানভীর এসেছে। তবে সে রাতে আমার ঘুম আসেনি। রাত তিনটার দিকে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যেন কম হয় এবং আমরা যেন বিজয়ী হতে পারি।

৫ আগস্ট সকাল হতেই ঢাকার বিভিন্ন স্পটে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকি। আমরা নিজেরাই সেদিন নিজেদের অভয় দিচ্ছিলাম; আর বলেছিলাম, "আজ আমরা সফল হবোই, ইনশাআল্লাহ।" পরের ইতিহাস তো সবারই জানা।

মুক্তিকামী জনতা যাত্রাবাড়ী থেকে, উত্তরা থেকে, গাবতলী থেকে ছুটতে থাকে শাহবাগের দিকে। এদিকে টিভিতে খবর আসে, সেনাবাহিনী প্রধান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। ইতোমধ্যে ফ্যাসিস্টের শেষ দুর্গ ঢাকার পতন হয়ে গেছে। আমরা নতুন বাংলাদেশ পাওয়ার খুশিতে একজন আরেকজনের সঙ্গে কোলাকুলি করছি, স্লোগান ধরছি। সবার চোখেমুখে অভূতপূর্ব বিজয়ের আনন্দ।

চিকিৎসক হিসেবে আমার লড়াই শুরু হয়েছিল হাসপাতাল থেকে, শেষ হয় রাজপথে। ●

জুলাই আগস্টের ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থান

মোছা. স্বপ্না আক্তার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল

বাংলাদেশের ইতিহাসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের প্রায় দেড় যুগের ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটেছে। ফ্যাসিবাদের পরবর্তী গণতান্ত্রিক ধারায় উত্তরণের সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশে। ২০২৪ সালের জুলাই আগস্টে মাসব্যাপী আন্দোলন সংগ্রাম হলেও এর শিকড় বিগত সময়ের স্বৈরতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোতে গাঁথা। দীর্ঘ দেড় দশকের অধিক সময় ধরে কর্তৃত্ববাদী শাসনের দমনপীড়ন, দুর্নীতি, বৈষম্য, বিচারহীনতা এবং রাজনৈতিক দমননীতি মানুষের মনে যে অসন্তোষ জমিয়ে রেখেছিল, তার বিস্ফোরণ ঘটে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কেবল আওয়ামী সরকারের পতনের আন্দোলন নয়, বরং এটি ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণ-সাহস, প্রতিবাদ, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, ডিজিটাল সংগঠন, এবং সামষ্টিক স্বপ্নের এক অগ্নিপরীক্ষা।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সূচিত হয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজে এবং দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। শেখ হাসিনার শাসনামলে সরকারি চাকরিতে ৫৬% কোটা বরাদ্দকৃত ছিল। বাকি শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৪৪%। মুক্তিযোদ্ধা ৩০%, নারী ১০%, আঞ্চলিক ১০% ও অন্যান্য বিশেষ কোটায় ৬% অধিক বরাদ্দ রেখে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা প্রথমে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের মাঝে শেখ হাসিনাকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে জবাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের অপশক্তি "রাজাকারের বংশধর" হিসেবে অভিহিত করার পর আন্দোলনটি সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকারের পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে রাজাকার ট্যাগ বা তকমা পাওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে "তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার"- স্লোগান দিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আর এভাবেই কোটা সংস্কার আন্দোলনটি কোটার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হাসিনার ফ্যাসিবাদের গদি নাড়া দিয়েছিল। তারপর শেখ হাসিনা একদিকে পুলিশ- র‍্যাব, বিজিবি, ও সেনাবাহিনী; অন্যদিকে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিল এদেশের ছাত্র-জনতার ওপর। ফলে আন্দোলনটি শুধু কোটা সংস্কারের আন্দোলনে থেমে না থেকে ক্রমান্বয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। যেখানে অন্যতম অবদান রেখেছিল এদেশের ছাত্র-জনতা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কোটাবিরোধী আন্দোলন দিয়ে শুরু হলেও এ আন্দোলনের পটভূমিতে ছিল দীর্ঘ ১৬ বছরের শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক গণবিস্ফোরণ। যার ফলে দলীয় নেতাকর্মী, সামরিক বাহিনী, প্রশাসন ও ভারতের সার্বিক সহযোগিতা নিয়েও গণবিদ্রোহের মুখে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেননি শেখ হাসিনা। বাধ্য হয়ে ৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়েছিলেন। মূলত, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অপহরণ, গুম, খুন, লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার, লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি, নির্বাচনের নামে তামাশা, বিরোধীদলের কণ্ঠরোধ, দ্রব্যমূল্য ৫ থেকে ৬ গুণ বৃদ্ধির ফলে বিগত দেড় যুগের গণ অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশের সম্মিলনে এ আন্দোলন গণবিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে।

সরকার কর্তৃক মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, এবং বিরোধীদল ও সাধারণ নাগরিকদের প্রতি দমন-পীড়ন সাধারণ জনগণের ক্ষোভকে উসকে দিয়েছিল। প্রতিটি সেক্টরে ছিল ভয়াবহ বৈষম্য। দ্রব্যমূল্য ছিল মানুষের নাগালের বাইরে। শেখ হাসিনার শাসনামলের শেষ ৫ বছরেই দেশে ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছিল প্রায় ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত। রাতের অন্ধকারে ভোটচুরি এবং কলঙ্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে টানা তিনবার ক্ষমতায় বসেছিলেন শেখ হাসিনা। তরুণ প্রজন্ম

ভোটার হয়েও নিজের ইচ্ছেমতো ভোট দিতে পারেনি গত ১৫ বছর, যা অনেক তরুণকে ক্ষোভে বিদ্ধ করেছিল। জনসাধারণ থেকে শুরু করে দেড় দশকেরও বেশি সময়ে সংবাদমাধ্যম, এমনকি সামাজিকমাধ্যমেও ছিল না বাক্স্বাধীনতা। বাগরুদ্ধ ছিল এদেশের মানুষ। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, খুন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। তরুণ সমাজ, বিশেষ করে ছাত্ররা- এই শাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল সাম্য, ন্যায়বিচার, এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি। শেখ হাসিনার দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনে জমে থাকা গণঅসন্তোষ এ আন্দোলনে প্রজ্বলিত হয়। ছাত্রদের দাবি ছাপিয়ে এটি একটি গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলন গণঅসন্তোষের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটায়।

এদিকে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এখনো ফ্যাসিবাদী অনেক সাংস্কৃতিক দিক রয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক অনকে চর্চা এখনো বাংলাদেশে বহমান। এখনো কালচারাল ফ্যাসিস্টরা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদকে ফেরত নিয়ে আসার পাঁয়তারা করছে। দেশের ছাত্র-জনতা যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চাচ্ছে তা আমরা দিতে অনেকটাই ব্যর্থ হচ্ছি। দেড় বছর অতিবাহিত হলেও এখনো সব ফ্যাসিবাদীদেরবিচার করতে সক্ষম হয়নি বাংলাদেশে। ফলে এদেশে আবার তাদের ফিরে আসার ঝুঁকি বিদ্যমান। ফ্যাসিবাদীদের ভোট পাওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট দল চেষ্টা করছে। ফলে ইতিবাচক রাজনীতির যে স্বপ্ন বাংলাদেশের মানুষ দেখেছিল, সেই স্বপ্নও হুমকির মুখে। এখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে নৈরাজ্য বিরাজমান, যা অধিকাংশ মানুষের নতুন বাংলাদেশ দেখার স্বপ্নকে হতাশাগ্রস্ত করছে। সেজন্য দল-মত, ধর্ম-বর্ণ সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে আমাদের উচিত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে রাজনীতি করা। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে আপামর জনতা ও দেশবাসীর চাওয়ার আলোকে রাজনীতি করা। রাজনীতিকে মেধা ও আইডিয়ার ভিত্তিতে সমৃদ্ধ করা উচিত। রাজনীতিতে শক্তি বা মাসল গিরির প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে ভালো কাজের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করে আগামীর রাজনীতি বিনির্মাণ করতে হবে। স্বৈরাচারী মনোভাব ও ধর্মকে পুঁজি করার রাজনীতি পরিহার করে বাংলাদেশে বহুধারার গণতন্ত্রের জনক, সফল রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আলোকেই আমাদের রাজনীতি করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং জুলাইয়ের চেতনার আলোকে নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রয়োগের মাধ্যমে আগামীর রাজনীতি বিনির্মাণে কাজ করে যেতে হবে। ●

অকুতোভয় সংগ্রামের বিশ দিন

আবুজার সেতু
সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর জেলা ছাত্রদল

ষোলো থেকে ছত্রিশ–
মাস নয়, এ এক আগুনপোড়া অধ্যায়।
দিন গুনে গুনে গেছে জ্বালা,
দেশের বুকে বয়েছে রক্তের হোলিখেলা।

আবু সাঈদের চোখ ছিল স্বপ্নে ভরা;
বুলেট ছিঁড়ে দেয় পাঁজর-মাংস,
তবু নড়ে না বুক–
শহীদ হলেও মুখে ছিল আত্মদানের সুখ।

ওয়াসিম শুধু একটি নাম নয়,
ছিলো প্রতিরোধের ডাক।
তাঁর মৃত্যু তো মৃত্যু নয়,
তা ছিল জাগরণ–
জ্বলন্ত চিতায় লেখা নতুন বিবরণ।

ষোলো তারিখে শুরু, ছত্রিশে চূড়া–
এ বিশ দিনে তরুণরা ভেঙেছিল ফ্যাসিবাদের বেড়া।

শুধু দু-তিনজন নয়, ছিল হাজারো কণ্ঠস্বর–
আবু সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধসহ সকল শহীদ অমর।

পেছনে ফিরলে আজও শোনা যায়
আহত-পঙ্গুদের আর্তনাদ,
রাজপথের দেয়ালে দেখা যায়
আন্দোলনের চিহ্ন, শহীদ পরিবারের ব্যথার বাঁধ।

জ্বলে উঠতে হবে আবু সাঈদদের সাহসে,
জেগে উঠতে হবে ওয়াসিমদের প্রতিরোধের ডাকে।
চব্বিশের ষোলো থেকে ছত্রিশ জুলাই–
এক পতাকা রাঙা,
তাতে লেখা
"আমরা হারি না,
আনি বিজয় বাঁধভাঙা।"

কীভাবে ভুলি তোমায়!

আদত শরীফ

আমি কীভাবে ভুলি সে রক্তমাখা ৩৬ দিনের কথা!
যখন আবু সাইদ মৃত্যুকে দু'হাত মেলে করেছিল আলিঙ্গন।
চট্টলার ওয়াসীমের গগনবিদারী স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল রাজপথ।
মুগ্ধের অগ্নিবাণ ছুঁয়ে দিয়েছিল নিভে যাওয়া আন্দোলনের বুক,
আবার জ্বলে উঠেছিল আশার শিখা প্রজন্মের হৃদয়ে।

আমি কীভাবে ভুলি নিষ্পাপ শিশুদের আত্মত্যাগ!
যখন রিয়া গোপ খেলছিল ছাদে, ফিরে এলো লাশ হয়ে।
নাইমা-সামিরদের হাসি হারিয়ে গেল গুলির শব্দে।
যখন ছোট্ট ফাইয়াজের রক্তে লাল হলো রাজপথ,
যে স্বপ্ন দেখেছিল শুধু পতাকা হাতে দেশ জয়ের।

কীভাবে ভুলি ইয়ামিন-নাফিজ তোমাদের,
মাদরাসার সেই তরুনদের,
যাদের স্বপ্ন ছিল শুধুই মুক্ত বাংলাদেশ।
বলো, আমি কীভাবে ভুলি সেই ৩৬ দিনের লাল ইতিহাসকে!

আলো হয়ে বাঁচে যারা

মো. রাফেউর রহমান
সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

দেশটা ছিল অন্ধকারে,
স্বৈরাচারের বুটে চাপা জীবন।
সত্য বলা ছিল অপরাধ,
ব্যালট ছিল এক পরিহাস।

তবু জেগে উঠেছিল রাজপথ,
স্লোগানে গর্জেছিল জনতার কণ্ঠ–
"বাংলাদেশ কার? জনগণের বাংলাদেশ!"

আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম–
তোমাদের রক্তে লেখা নতুন ভোরের গান।
জুলাইয়ের আগুনে পুড়ে
জন্ম নিয়েছিল স্বাধীনতার দ্বিতীয় অধ্যায়।

আজ দেশ দাঁড়িয়ে আলোয়,
স্বৈরাচার ম্লান হয় ইতিহাসে–
তোমাদের নাম বেঁচে থাকে
মাটির শিরায়, মানুষের নিশ্বাসে।

মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক

মো. আব্দুল ওহেদ
ক্রীড়া সম্পাদক, কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ওরা জিব্রাইলের ডানায় ভর করে ফিরে আসে বারবার,
পিচঢালা রাস্তায় রক্তে লিখে যায় নাম মৃত্যুর ফেরেস্তায়।
দেশমাতৃকা, মানুষের তরে দিয়ে যায় প্রাণ শত সহস্রবার–
ওরা মানুষ নয়, ফেরেস্তা খোদার; নেমে আসে দুনিয়ায়।

যখনই হায়না, শকুন, শৃগাল ঘিরে ধরে মাতৃভূমি,
ওয়াসিম, সাঈদ, মুগ্ধ – ওরা জেড-ফোর্সের সৈনিক।
জিয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত মহামন্ত্র-বাণী: "স্বাধীন মাতৃভূমি",
স্বাধীনতা সমুজ্জ্বল করিতে আসে মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক।

ওরা আবাবিলের মতো ছুটে আসে জুলাইয়ের ময়দানে,
স্বল্প বিপ্লবী প্রতিরোধ গড়ে, ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।
এক মৃত আত্মার ডাকে ছুটে আসে শতসহস্র জনে –
স্বৈরাচার, খুনি, দেশদ্রোহীর জলসা ধ্বংসিবে বলে।

জুলাই আমার রক্তমাখা বিদ্রোহীদের দীপ্ত পদধ্বনি।
বন্ধু, ওরা গণমানুষ– পথচারী, উদবাস্তু, টোকাই বলি।
ওরাই ছিল 'জুলাই যুদ্ধ'র আগ্নেয়গিরি, দাবানলের অগ্নি,
তাঁদের থেকেই ফিরে দেখা – স্বাধীন জিয়ার পুণ্য মাতৃভূমি।

শহীদ কন্যার কথা

আনিকা ইসলাম আখি মনি
গাজীপুর মহানগর ছাত্রদল

আমি এক শিশু কন্যা, আমার জন্ম হলো আজ-
জন্মের পর কানের পাশে শুনতে পাইনি
পিতার কণ্ঠের আজানের সুর–
কেটে গেল জন্ম রাত, চারিদিকে হলো ভোর,
এখনো শুনতে পাইনি পিতার স্বর।

চোখ ঘুরিয়ে খুঁজছি আমি, পাচ্ছি না তো বাবাকে।
একটুখানি নিয়ে যাও না বাবার কাছে আমাকে!
মায়ের চোখে পানি দেখি, দাদা-দাদুও কাঁদে–
তাহলে কি আমাকে পছন্দ হয়নি তাদের?

একদিন, দুদিন, তিনদিন গেল বাবা এলো না।
কোথায় গেছে আমার বাবাড় কেউ বলে না!
সবাই শুধু কাঁদতে থাকে, চুপ করে রয় আমার ডাকে।
বাড়িভর্তি মানুষ আমায় দেখতে আসে রোজ–
তাদের থেকেই পেয়ে গেলাম আমার বাবার খোঁজ।

নবজাতক কন্যা আমি, বুঝে গেলাম কথার মানে।
হায় আল্লাহ! এ কী শুনলাম? এতিম হয়েই জন্ম নিলাম?
যদি পিতৃস্নেহ না-ই বা দিলে– দুনিয়াতে কেনো পাঠালে?
বাবা ছাড়া শিশুর ব্যথা– তুমি তো জানো আমার কথা!
তবুও কেনো কেড়ে নিলে আমার প্রাণপ্রিয় পিতা?

হাতের আঙুল ধরে বলতে পারবো না–
"বাবা, আমায় তোমার সাথে নিয়ে যাবে না?"
বাবার কাঁধে চড়ে পৃথিবী দেখবো না,
পিঠে উঠে ঘোড়ায় চড়া আমার কখনো হবে না।
আমি, শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির নবজাতক কন্যা বলছি–
বাবাকে ছাড়া একাই আমি একটু একটু করে চলছি।

ছবি: জীবন আহমেদ

রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে কলেজ শাখায় ভর্তি হওয়া গোলাম নাফিজ যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীদের নায্য দাবি কোটা সংস্কার আন্দোলনে। ৪ আগস্ট বিকাল সাড়ে চারটার দিকে ফার্মগেটের ফুট ওভারব্রিজের নিচে লীগ সন্ত্রাসী ও পুলিশের যৌথ আক্রমনে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। গুলিটা হৃদপিণ্ড বরাবর এফোড় ওফোড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। রক্তশূণ্য মৃতপ্রায় দেহটি রিশকাচালক নূর মোহাম্মদ তার রিকশার পাদানিতে তুলে হাসপাতালের দিকে রওনা হন। তখনও নাফিজ বেঁচে ছিলো। রিকশার রডটি হাতে মুঠি দিয়ে ধরে রেখেছিল নাফিজ। রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ নাফিজকে নিয়ে প্রথমে আল রাজি হাসপাতালের দিকে ঢুকতে গেলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বাধা দেয়। পরে রিকশাচালক তাকে খামারবাড়ির দিকে নিয়ে ছোটেন। ঐ সময়েই দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ ছবিটি তোলেন । পরদিন ৫ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টার পর পত্রিকাটির প্রথম পাতায় ছাপা শহীদ নাফিজের এই ছবি। মুহূর্তের মধ্যেই ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় ১৭ বছরের কিশোর নাফিজের এই ছবি। এই ছবি দেখেই নাফিজের মা-বাবা সন্তানের খোঁজ পান। নাফিজের এই ছবি পুরো দেশ কাঁদিয়ে দেয়; কাঁপিয়ে দেয়। পরদিন ৫ আগস্ট ২০২৪, গণ মানুষ দেখায় তাদের গণ বিস্ফোরণ; পুরো দেশের সব রাজপথ তখন জনসমুদ্র। নাফিজ জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন। ●

গত ১৮ জুলাই ২০২৪, সাভার বাসস্ট্যান্ড-মডেল মসজিদ এলাকায় শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের কর্মীরা সম্মিলিতভাবে হামলা চালায়। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনে অংশ নেওয়া মিরপুরের এমআইএসটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী শাইখ আসহাবুল ইয়ামিনকে ধরে টেনে পুলিশের সাঁজোয়া যানের কাছে নিয়ে যায়। দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তার বুকের বাম পাশে গুলি করা হয়। বন্দুকের গুলিতে ইয়ামিনের বুকের বাম পাশে অসংখ্য স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়।

এ অবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা ইয়ামিনকে টেনে সাঁজোয়া যানের ওপর ফেলে রেখে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতাকে ভীত করার উদ্দেশ্যে গাড়িটি বারবার এপাশ-ওপাশ চালাতে থাকে। এরপর ইয়ামিনকে প্রায় মৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। সাঁজোয়া যানের ভেতর থেকে এক পুলিশ সদস্যকে বের করে ইয়ামিনের পায়ে পুনরায় গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ওই সদস্য ইয়ামিনকে মৃত ভেবে গুলি না করে রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে রোড ডিভাইডারের পাশে ফেলে দেন।

গুলিবিদ্ধ শাইখ ইয়ামিনকে তখনও সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে নিশ্বাস নিতে দেখা যায়। এমন অবস্থায় পুলিশ সদস্যরা তাকে ধরে উঁচু রোড ডিভাইডারের এক পাশ থেকে আরেক পাশে ছুড়ে ফেলেন। পরে তাকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশের ভয়াবহ বর্বরতার সেই দৃশ্য ও ভিডিও মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কেঁদে ওঠে বাংলার বিবেকবান মানুষ। এরপর থেকেই মৃত্যুভয়কে জয় করে রাস্তায় নেমে আসে তরুণ প্রজন্মাড়লম্বা হতে থাকে মিছিলের সারি, জেগে ওঠে এক নতুন প্রতিবাদের ঢেউ। ●

ছবি: সংগৃহীত

১৯৭১ সালের উত্তাল মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তোলা এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধাকে। তাঁরা রাইফেল, সাবমেশিনগান তাক করে রয়েছেন শত্রুর দিকে। বয়সে তরুণ হলেও তাঁদের চোখে অদম্য সাহস, হৃদয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা সেই প্রজন্ম, যাঁরা জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা ভুলে মাতৃভূমির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে।

নদীর পাড়ে, খোলা আকাশের নিচে, সাদাকালো এই ফ্রেমে যেন ধরা আছে একটি জাতির আত্মত্যাগের মুহূর্ত। যে মুহূর্ত থেকে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ। তাঁদের চোখের দৃঢ়তা আজও বলে দেয়- স্বাধীনতার শপথ একবার নেওয়া হলে তা আর মুছে যায় না। তাঁরা বেঁচে আছেন সময়ের প্রতিটি রক্তধারায়, প্রেরণার প্রতিটি জোয়ারে, ইতিহাসের প্রতিটি অক্ষরে।

ছবি: নাইব উদ্দিন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তোলা এই হৃদয়বিদারক ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্বজনহারা, গৃহহারা বাঙালি নারী-পুরুষ-শিশুদের এক মর্মস্পর্শী যাত্রা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের ভয়ে তারা প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে সীমান্তের পথে অনিশ্চিত আশ্রয়ের খোঁজে পা বাড়িয়েছেন। কারও কাঁধে ঘরের শেষ সম্বল, কারও হাতে শিশু, কেউবা খালি পায়ে কাদা মাড়িয়ে হেঁটে চলেছে জীবন আর মৃত্যুর মাঝপথে। এই চলমান মানবস্রোতই ছিল বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ শরণার্থী স্রোত। যেখানে কোটি মানুষ প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু বুকের ভেতর ধারণ করেছিল একটাই আশা- একদিন ফিরে যাবে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। *ছবি: সংগৃহীত*

মুক্ত রৌমারীর এই দৃশ্য যেন ইতিহাসের নিঃশব্দ কবিতা– যেখানে মেজর জিয়ার ঘোষণায় ও নেতৃত্বে মুক্তির মানচিত্রে প্রথম আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। যে সহযোগিতা, যে দৃঢ়তা, যে কৌশলগত ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে রৌমারী পরিণত হয়েছিল মুক্তাঞ্চলে, তা শুধু একটি বিজয়ক্ষণের গল্প নয়– তা ছিল জাতির আত্মাকে পুনর্জাগরণের পূর্বসংগীত। ১৯৭১-এর সেই প্রতিরোধ ধীরে ধীরে রূপ নেয় স্বাধীনতার মহাকাব্যে, যেখানে সাধারণ মানুষের সাহসই হয়ে ওঠে সর্বশক্তিমান অস্ত্র। গ্রামবাংলার মাটি, নদী, খেত ও জনপদের নিঃশব্দ শপথই আমাদের এনে দেয় মুক্তির ভোর। আর সেই একই অদম্য মনোবল, সেই একই মানুষের শক্তি– বহু দশক পরে আবারো জ্বলে ওঠে ২০২৪-এর গণআন্দোলনে, যেখানে বাংলাদেশিরা প্রমাণ করে যে মুক্তির চেতনাকে কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। ইতিহাস যেন বলেই দেয়– 'আমাদের প্রতিরোধ কখনো থেমে থাকে না, কেবল নতুন রূপে ফিরে আসে'। ●

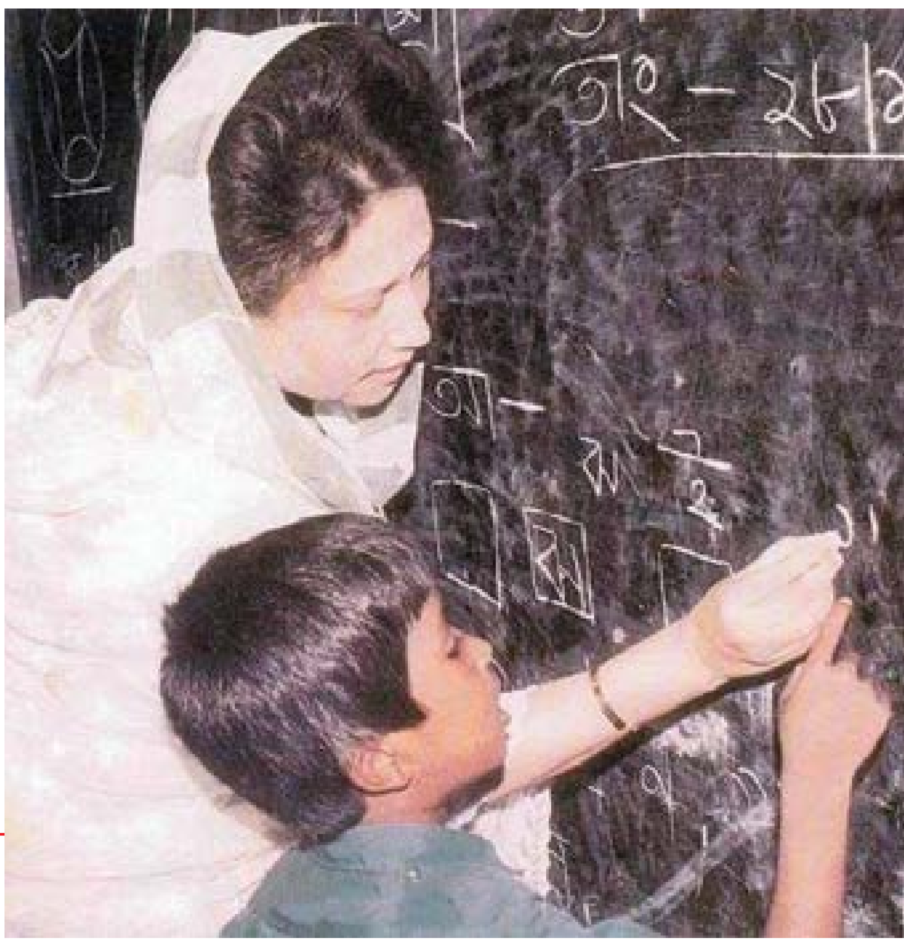

১৯৯৩ সালের ২৯ নভেম্বর, কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সাইক্লোন সেন্টারের ওপর গড়ে ওঠা একটি স্কুলে এক শিশুশিক্ষার্থীর পাশে স্নেহভরা হাত রেখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শিশুটিকে এগিয়ে যেতে, স্বপ্ন দেখতে এবং পড়াশোনায় মনোযোগী হতে অনুপ্রাণিত করছেন। ●